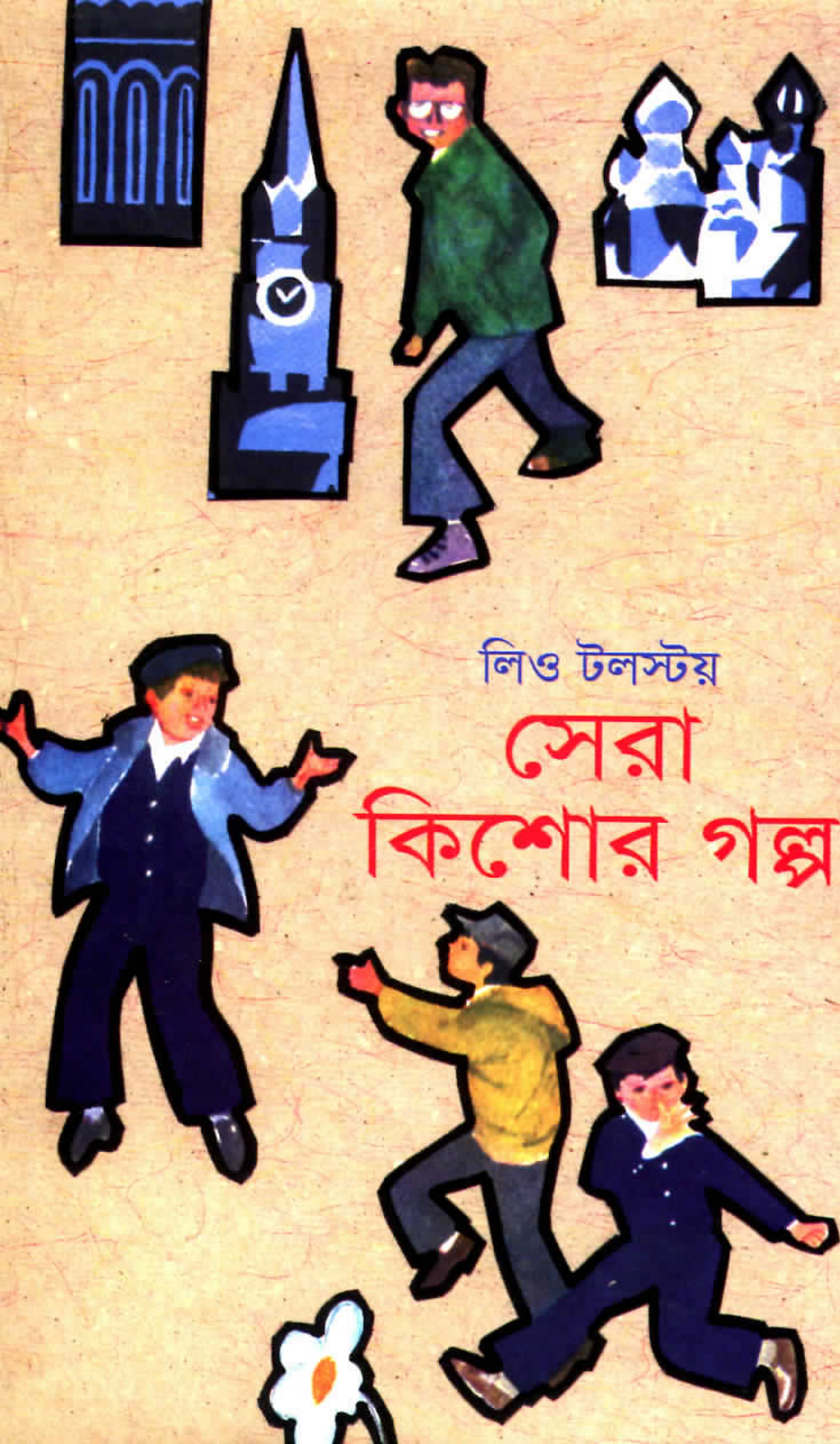

লিও টলস্টয়

সেরা কিশোর গল্প

চিরায়ত গ্রন্থমালা

আলোকিত মানুষ চাই

লিও টলস্টয়

সেরা কিশোর গল্প

সম্পাদনা
শহিদুল আলম

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৩২

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
পৌষ ১৪০১ জানুয়ারি ১৯৯৫

প্রথম সংস্করণ দশম মুদ্রণ
কার্তিক ১৪১৫ অক্টোবর ২০০৮

প্রকাশক
হুমায়ূন কবীর
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং
৯ নীলক্ষেত, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
সত্তর টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0131-X

ভূমিকা

মানবপ্রতিভার অন্যতম বিস্ময় লিও টলস্টয় বিশ্বসাহিত্যের সেরা শিল্পীদের একজন। ধর্ম, বর্ণ, জাতি, কাল, ভূগোল আর ইতিহাসের সবরকম সীমারেখা লঙ্ঘন করে তিনি মানুষের জন্যে রেখে গেছেন এক কালজয়ী উত্তরাধিকার। রাশিয়ার লেখক লিওনিদ লিওনভ্ একবার বলেছিলেন : "আমাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে আমরা ধনী, কারণ আমরা টলস্টয়ের উত্তরপুরুষ।" অন্যদিকে বলা হয়ে থাকে, গত পাঁচশো বছরে পৃথিবীতে এমন চারজন সাহিত্যিক আবির্ভূত হয়েছেন যাঁদেরকে গ্রিক পুরাণের হারকিউলাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়। নিজ নিজ দেশকালের গভীরে প্রবেশ করে জগৎ ও জীবনের এক সর্বকালীন সুমহান তাৎপর্য তাঁরা আবিষ্কার করেছেন। তাই তাঁরা শুধু আপন দেশের শ্রেষ্ঠ লেখক নন, তাঁরা বিশ্বশ্রেষ্ঠ। এই চারজন লেখক হলেন—ইংল্যান্ডের শেক্সপিয়র, জর্মনির গ্যাটে, রাশিয়ার টলস্টয় এবং ভারতের রবীন্দ্রনাথ।

এ-কথা সত্যি যে, টলস্টয়ের নামের আগে বাছা-বাছা কিছু বিশেষণ প্রয়োগ করে আসল লেখকটির কিছুই বোঝানো সম্ভব নয়। বিরাশি বছরের দীর্ঘজীবনে তিনি লেখক হিসেবে তো বটেই; জটিল দার্শনিক, সামাজিক, নৈতিক ও নীতিশাস্ত্রীয় এমনকি ব্যক্তিগত জীবনভাবনা দিয়েও বারবার জগতের মানুষকে আলোড়িত করেছিলেন। বিশ্বসাহিত্যের পাঠকদের মুখে-মুখে উচ্চারিত হয় যে-উপন্যাসগুলোর নাম— 'যুদ্ধ ও শান্তি' ; 'আন্না কারেনিনা' এবং 'পুনরুত্থান' ; লেখকদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই লেখকের জীবনীপঞ্জিটি আমাদের তলিয়ে দেখা কিঞ্চিৎ জরুরি।

১৮২৮ সালের ২৮ আগস্ট পারিবারিক জমিদারি ইয়াস্নায়া পলিয়ানায় লিও নিকলায়েভিচ টলস্টয়ের জন্ম। জন্মসূত্রে তিনি রাশিয়ার অভিজাতশ্রেণীর একজন ছিলেন। তাঁর দু'বছর বয়সে মায়ের মৃত্যু হয়। ভাইবোন-সমেত টলস্টয় লালিত হন খালার কাছে, ইয়াস্নায়া পলিয়ানার উন্মুক্ত গ্রামীণ পরিবেশে। সেকালের রাশিয়ার অভিজাতদের উপযুক্ত শিক্ষার পাশাপাশি ফরাসি ও জর্মন ভাষা রপ্ত করেন। পাঁচবছর বয়সেই টলস্টয় ফরাসি ও রুশি বর্ণমালা রপ্ত করতে পেরেছিলেন। শৈশবে তিনি আদুরে, অভিমানী, জেদি, আত্মসচেতন ও ছিচকাঁদুনে ছেলে ছিলেন। অপরের দুঃখকষ্ট বিন্দুমাত্র সইতে পারতেন না, নিজেও মানসিক আঘাত পেতেন সামান্য কারণেই। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার কথা ভেবে বিপত্নীক পিতা টলস্টয়-এর ন'বছর বয়সে গ্রাম ছেড়ে মস্কো শহরে নিয়ে আসেন। এখানে আসার পাঁচমাস পরই অকস্মাৎ পিতার মৃত্যু হয়। খালার আদরে এবং বারোজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এখানে সবার পড়াশোনা এগিয়ে চলে।

টলস্টয় দুর্দমনীয়রূপে আত্মসচেতন ও জেদি হয়ে ওঠেন। আহত অহংবোধে একবার

দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন। ভাগ্য ভালো, স্রেফ ১৮ ঘণ্টা অজ্ঞান থেকে নির্বিঘ্নে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ান। নিজের চেহারা সম্বন্ধে হীনমন্যতা থাকায় ছেলে বা মেয়ে যারাই সুন্দর তাদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতেন। লিউবোফ নামে প্রায় সমবয়সী এক বালিকাকে অপরের সাথে কথা বলতে দেখে এতই ঈর্ষান্বিত হন যে তাকে ব্যালকনি থেকে ফেলে দেন। বেচারি মেয়েটি ভালোমতো জখম হয়, সারতে সময় লাগে। ভাগ্যরহস্য এই যে, এই মেয়েটির কন্যা সোফিয়াকে তিনি পঁচিশ বছর বয়সে বিবাহ করেন।

বারো বছর বয়সেই বালক টলস্টয় গল্প-লেখার চেষ্টায় গোপনে খাতা ভরাতে শুরু করেন। তাঁর মনোভূমি তৈরি হয় বাইবেল, আরব্যরজনী, রাশিয়ার লোককথা, পুশকিনের কবিতা পাঠের মাধ্যমে।

ষোলো বছর বয়সে ভর্তি হন কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে, উদ্দেশ্য—কূটনীতিবিদের কর্মজীবন গ্রহণের জন্য তৈরি হওয়া। নিজেকে ক্রমাগত আয়নায় দেখেন আর নিজের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা পুঞ্জীভূত হয়: এই খুদে খুদে পাংশুটে চোখ। বুদ্ধিমত্তার কোনো ছাপই নেই, নির্বোধ চাউনি—সবচেয়ে জঘন্য, কুৎসিত, বদখত....আমার মুখ নিতান্ত সাধারণ চাষাভূষার, আমার হাত-পাও সে-রকমই, লম্বাটে।"

সতেরো বছরের তরুণ টলস্টয় নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা চাওয়া-পাওয়ার স্বরূপ চিনতে চাওয়ার নিদারুণ শ্রম ও উৎকণ্ঠা পূর্ণ! শরীরময় উষ্ণ আকাঙ্ক্ষা অথচ পবিত্রতার বোধকে নিয়ত বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রার্থনা ও কৃচ্ছ্রসাধনার কাছে আত্মসমর্পণ—এই পরস্পরবিরোধী চরিত্র টলস্টয়ের মনে এক জটিল ও অন্তর্ঘাতময় আবহের সূত্রপাত করে। এই দ্বন্দ্বের দুঃসহ হাত থেকে তিনি পরবর্তী জীবনের একটি মুহূর্তও রেহাই পাননি। বিশেষ করে উনিশ বছর বয়সে যখন তিনি জীবনের নীতিমালায় প্রতিজ্ঞা লিপিবদ্ধ করছেন : "সমগ্র জীবনের লক্ষ্যবিন্দু চাই, অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ের জন্য লক্ষ্য এবং একেকটি বছরের জন্যেও ; প্রতিমাসের জন্য, প্রতিসপ্তাহের জন্য, প্রতিদিনের জন্য, প্রতিঘণ্টার জন্য এবং প্রতিমিনিটের জন্যও লক্ষ্য চাই ; বৃহত্তম লক্ষ্যের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষ্য বিসর্জন দিতে হবে; মেয়েদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে; কাজের মাধ্যমে কামনাকে ধ্বংস করব; ভালো হতে হবে,কিন্তু শোরগোল তুলে নয়; যতখানি সম্ভব কম খরচে জীবন নির্বাহ করা চাই, যদি দশগুণও ধনী হই জীবনযাত্রার মান যেন না পাল্টায়"— ইত্যাদি।

টলস্টয়ের জীবনের সাধ্য ও সাধনা, ভোগ ও ত্যাগ: সমাজ সত্য ও আত্মিক সত্যের নিরন্তর সংগ্রাম এখন থেকে শুরু হয়, যা আমৃত্যু থামে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনাও তার শেষ হয় স্বাস্থ্যের অজুহাতে এ-বয়সেই। এরপর জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সঙ্গে ক্রমাগত জড়িয়ে পড়েন এবং গভীরভাবে ডুবে যান সাহিত্যভাবনার সঙ্গে। তার প্রধানতম সাহিত্যকর্মগুলো হচ্ছে, আত্মজীবনীমূলক রচনা 'শৈশব', 'কৈশোর', 'যৌবন', 'কসাক', 'সেভাস্তোপল-এর কাহিনী', 'যুদ্ধ ও শান্তি', 'আন্না কারেনিনা', 'ইভান ইলিচের মৃত্যু', 'ক্রয়টজার সোনাটা', 'শয়তান', 'পুনরুত্থান', 'হাজি মুরাৎ', 'ককেসাসের বন্দী', 'ফাদার সিয়োর্গি' ইত্যাদি। এই সমস্ত লেখাগুলো প্রকাশের সঙ্গেসঙ্গেই তিনি নিজদেশে তো বটেই, সারা বিশ্বেই বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন। উপন্যাসের জগতে অনেক সমালোচকই 'যুদ্ধ ও শান্তি'-কে এক নম্বরে স্থান দিয়ে থাকেন। 'আন্না কারেনিনা'

প্রকাশের পর আরেক মহান রুশ ঔপন্যাসিক ফিয়দর দস্তয়োভস্কি তাঁকে 'শিল্পের দেবতা' হিসাবে উল্লেখ করে লিখেছেন : 'শিল্প হিসেবে আন্না কারেনিনা সম্পূর্ণ ক্রটিহীন।' আর রুশ-সাহিত্যের মহত্তম সামাজিক উপন্যাস হিসেবে বইটিকে শনাক্ত করেছিলেন টমাস মান।

টলস্টয় নিজের আত্মাকে উন্মোচন করে দেখিয়েছেন কখনো-বা স্বনামে, কখনো-বা তাঁরই লেখা গল্প-উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের ছদ্মনামে; সর্বদা ছুটে গেছেন সমকাল ও চলতি হাওয়ার বিপরীতে, লড়েছেন অন্যায়, আলস্য ও হিংসার বিরুদ্ধে, জীর্ণ সভ্যতার পুঞ্জীভূত কদর্যতার সঙ্গে সংগ্রাম করে গেছেন। যেহেতু তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন, তাই জনগণের ভেতর প্রগতিশীলরা সান্ত্বনা লাভ করত এই দেখে যে, তাদের নিকটেই একজনের হৃদস্পন্দন শোনা যাচ্ছে—যে-হৃদয় কলুষিত হবে না কখনো, তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে তিনি তাকিয়ে দেখছেন তাদের অমানুষিক শ্রম ও বঞ্চনা, কান পেতে শুনে যাচ্ছেন তাদের ক্রন্দন ও সঙ্গীত; আর সময় হলে এ-সবই রূপান্তরিত হবে খাঁটি সোনায়, ভবিষ্যতের নতুন পৃথিবীর ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে যাবে।

ক্রুদ্ধ ঝঞ্চাবেগ ও মৃদুতম বায়ুহিল্লোল, মরচুক্ষর পক্ষে যা ধারণা করা সম্ভব নয় এবং যা চোখ এড়িয়ে যায় মানুষের সেরকম বিশাল ও ক্ষুদ্র উভয়ই, মানুষের ব্যক্তিসত্তার মধ্যাহ্নপ্রাখর্য ও অস্তরাগ—ধরা দিয়েছিল তাঁর চোখে।

ক্ষুদ্র এই কিশোরপাঠ্য সংকলনের গল্পগুলো পড়তে গেলেও উপরোল্লেখিত মন্তব্যটির যথার্থতা লক্ষ করা যাবে। টলস্টয়ের বর্ণনা-কৌশলের অদ্ভুত দৃষ্টিতে যেন কোনো ঘটনার সামান্যতম অংশও বাদ যায় না—চোখের সামনে ফুটে ওঠে গল্পের সবটুকুই।

এই গ্রন্থের সবগুলো গল্পই কিশোরদের মনোভূমি স্পর্শ করে লেখা। প্রতিটি গল্প টলস্টয় শেষ করেছেন মানুষের, সহজাত সরলতা ও সততার প্রতি দৃঢ় আস্থা স্থাপন করে—যাতে ক্ষুদে পাঠকেরা জীবনের এক-একটি সত্যকে গল্পের আস্বাদ পেতে-পেতেই পরম সত্যরূপে উপলব্ধি করতে পারে। কেননা আত্মার পরিশুদ্ধ আনন্দই টলস্টয় প্রত্যাশা করতেন সবচেয়ে বেশি।

এই বইয়ের আটটি সুন্দর গল্প পাঠ-শেষে-তরুণ পাঠকেরা টলস্টয় সম্পর্কে আরো আগ্রহী হয়ে উঠবে বলেই আমাদের ধারণা। কেননা মনে রাখতে হবে, টলস্টয় পাঠ না-করার অর্থ হচ্ছে বিশ্বসাহিত্যের বিশাল একটি রত্নভাণ্ডার থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখা।

শহিদুল আলম

২২/২ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট
হাতিরপুল, ঢাকা।

সূচি

শিশুর সরলতা ১১

মানুষ কী নিয়ে বাঁচে ১৩

মুরগির ডিমের মত বড় শস্য–কণা ২৮

এক টুকরো রুটি ৩১

মানুষের ভালোবাসা ৩৫

ঈশ্বর সবই দেখতে পান ৪৪

কতটা জমি দরকার ৫১

আগুনের একটি কনা ৬৩

শিশুর সরলতা

সেবার বড়দিন পর্ব বেশ আগে শুরু হয়েছে। বাগানে তখনও তুষার জমে, গ্রামের রাস্তায় তুষার গলে পানির স্রোত বয়ে যায়।

দুটি বাড়ির মধ্যে সরু একটি গলি। সেখানে দেখা হল দুবাড়ির দুটি মেয়ের। বাড়ির ময়লা পানি জমে ছোট একটা ডোবার মতো হয়েছে গলিটায়। একটা মেয়ে খুবই ছোট, আর আরেকটি একটু বড়। দুজনার মা-ই বেশ নতুন জামা-কাপড় পরিয়ে দিয়েছে তাদের। ছোট মেয়েটির কাপড়ের রং নীল, বড়টির হলদে। এ ছাড়া দুজনার মাথায় জড়ানো লাল রুমাল। এইমাত্র তারা গির্জা থেকে ফিরেছে। প্রথমে একে অপরকে তারা নিজের জামা-কাপড় দেখাল, তারপর শুরু করল খেলতে। একটু পরেই তাদের ইচ্ছে হল পানি ছিটাছিটি করবে। ছোটমেয়েটি তো জামা-কাপড় আর জুতো পরেই নেমে যাচ্ছিল, তাকে থামাল বড়মেয়েটি। সে বলল, অমন করে পানিতে নেমো না মালাশা, তোমার মা রাগ করবেন। আমি আমার জুতো-মোজা খুলে রাখছি, তোমারটাও তুমি খুলে ফ্যালো।

তাই হল, জুতো-মোজা খুলে পানিতে গিয়ে নামল তারা হাঁটু অবধি ঘাগরা উঁচু করে। পানিতে হেঁটে একজন অন্যজনের দিকে যেতে লাগল। মালাশার পা অবধি পানিতে ডুবে গেছে। সে বলে উঠল, আমার ভয় করছে আকুলিয়া; পানি মনে হয় অনেক।

আকুলিয়া বলল, চলে এসো না ! ভয় নেই। এর চেয়ে বেশি পানি কোথাও নেই।

তারা যখন অনেকটা কাছাকাছি এসেছে তখন আকুলিয়া বলল, সাবধান মালাশা, পানি ছিটিও না যেন ! সাবধানে হেঁটো।

তার কথা যেই শেষ হয়েছে অমনি মালাশার পা-টা এত জোরে পড়েছে যে খানিকটা পানি ছিটকে গিয়ে আকুলিয়ার জামা-কাপড়ে তো লেগেছেই, মুখে-চোখেও লেগেছে।

জামা-কাপড়ের এ দুরবস্থা দেখে রেগে সে মারতে গেল মালাশাকে। মালাশা দেখল, মহা মুশকিল ! ভয় পেয়ে সেও ওখান থেকে উঠে দৌড়াতে লাগল বাড়ির দিকে।

ঠিক সে-সময়ে আকুলিয়ার মা সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। মেয়ের কাপড়-জামায় ময়লা পানির দাগ দেখে সে রেগে উঠল, লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, কাপড়-জামার এরকম ছিরি করলি কী করে ?

মেয়ে বলল, মালাশা ইচ্ছে করে এরকম করে দিয়েছে।

আকুলিয়ার মা এ-কথা শুনেই মালাশাকে ধরে এনে এক থাপ্পড় মেরে দিল তার ঘাড়ে। মালাশাও এমন জোরে কেঁদে উঠল যে রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশ অবধি তার চিৎকার ছড়িয়ে পড়ল। তখন মালাশার মা-ও এল রাস্তায় বেরিয়ে। এসেই সে বলে উঠল, 'আমার মেয়েটাকে মেরেছ কেন গো?'—বলেই চেঁচামেচি শুরু করল। দেখতে দেখতে তুমুলভাবে বেধে উঠল ঝগড়া। বাড়ির পুরুষরাও দৌড়ে এসে জমায়েত হল রাস্তায়। সবাই কথা বলছে প্রাণপণ চিৎকার করে, কারো কথা কেউ শুনছে না। ঝগড়া চলতেই লাগল। একজন আরেক জনের গায়ে একটু ধাক্কা দিতেই মারামারি শুরু হয় আর কী! এমন সময় বেরিয়ে এল আকুলিয়ার বুড়ো দাদি। সবাইকে শান্ত হবার উপদেশ দিয়ে বুড়ি বলল, তোমরা এ কী শুরু করেছ বাছারা! এরকম করা কি ঠিক হচ্ছে, বিশেষ করে আজকের মতো ইস্টারের দিনে? পরব আসে আনন্দ করবার জন্যে, ঝগড়া করবার জন্যে তো নয়।

বুড়ির কথা তখন কে শুনবে? তাদের ধাক্কায় বুড়ি প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। ঝগড়া থামাবে এমন সাধ্যই ছিল না বুড়ির।

অবশেষে সে ঝগড়া আবার থামল মালাশা আর আকুলিয়ার কারণেই। মায়েরা তখনও গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করছিল একে অন্যের সঙ্গে। সেই সুযোগে আকুলিয়া জামার ময়লা ধুয়ে আবার গিয়ে ডোবায় নেমেছে। সরু মাথঅয়ালা এক টুকরো পাথর নিয়ে সে মাটি খুঁড়ছিল ডোবার পানি রাস্তায় গড়িয়ে আনবে আশায়। তাই দেখে মালাশাও ওর সঙ্গে এসে যোগ দিল। ছোট একখানা লাঠি নিয়ে সে মাটি-খোঁড়ার কাজে আকুলিয়াকে সাহায্য করতে লাগল। লোকগুলো যখন মারামারি শুরু করতে যাচ্ছে ঠিক এমনি সময় পানি এসে রাস্তায় পড়ল। ঠিক যেখানে দাঁড়িয়েছিল তারা, আর বুড়ি যেখানে দাঁড়িয়ে তাদের ভেতর মিটমাটের চেষ্টা করছিল সেখান অবধি এল পানি। মালাশা তার হাতের লাঠিখানা ফেলে দিয়েছে স্রোতের মুখে। স্রোতের দুপাড় দিয়ে চলছে মেয়েদুটি সেই লাঠির পিছু-পিছু।

আকুলিয়া চিৎকার করছে, ধরো মালাশা, লাঠিটা ধরো।

মালাশাও এমন হাসি হাসছিল যে, হাসির চোটে কথা বলতে পারছিল না।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারা লাঠির পিছনে ছুটতে ছুটতে লোকগুলোর কাছেই এসে পড়ল। তাই দেখে বুড়ি লোকগুলোকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমাদের কি এতটুকুও লজ্জা করছে না? তোমরা ঝগড়া করছ যাদের নিয়ে তারা কিনা দিব্যি সব ভুলে গিয়ে আবার মনের আনন্দে খেলায় মেতেছে। আহা সোনার চাঁদ বাছারা, বড়দের চেয়ে তোদের জ্ঞানবুদ্ধিই না- জানি বেশি।

লোকগুলো মেয়েদুটির দিকে চেয়ে লজ্জিত হল। তারা তখন হাসাহাসি করতে করতে চলে গেল যে-যার ঘরের দিকে।

শিশুর মতো সরল যে হতে পারবে না, তার ঠাঁই কখনো স্বর্গে হবে না।

মানুষ কী নিয়ে বাঁচে

এক

এক মুচি তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে একজন চাষীর বাড়ির এককোণে পড়ে থাকত। তার নিজের ঘর-বাড়ি জমি-জমা কিছুই ছিল না। মুচির কাজ করেই সে তার সংসার চালাত।

তখন রুটির দাম ছিল চড়া, আর মজুরি ছিল কম; কাজেই রুজি-রোজগার যা হত দেখতে না-দেখতেই তা যেত ফুরিয়ে।

মুচি আর তার স্ত্রী একটিমাত্র চামড়ার কোট ভাগাভাগি করে গায়ে দিত। সে-কোটটারও তখন জীর্ণ দশা। তাই সে একটা নতুন কোট বানাবে বলে ভেড়ার চামড়া কিনবার জন্য তৈরি হতে লাগল।

শীত পড়বার মুখেই মুচির হাতে বেশকিছু টাকা জমল ; তার স্ত্রীর ট্রাঙ্কে জমল তিন রুবল, আর গাঁয়ের চাষীদের কাছে তার পাওনা হল পাঁচ রুবল কুড়ি কোপেক।

একদিন সকালে মুচি তার বউয়ের সুতির জ্যাকেট পরল শার্টের উপর, তার উপর চড়াল তার গরম কাফ্‌তান। তারপর তিন রুবল পকেটে ফেলে বেড়াবার একটা লাঠি কেটে নিয়ে রওনা হল।

যেতে যেতে ভাবল : "চাষীদের কাছ থেকে আগে পাঁচ রুবল আদায় করব, তার সঙ্গে যোগ করব পকেটের তিন রুবল; আর তাই দিয়ে কিনব নতুন কোটের জন্য একটা ভেড়ার চামড়া।"

গাঁয়ে পৌঁছে প্রথমে গেল একজন চাষীর বাড়ি। চাষী তখন বাড়ি নেই। তার বউ বলল, "এখন তো কিছু দিতে পারব না, তবে এক হপ্তার মধ্যে টাকা-সমেত আমার স্বামীকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।"

গেল আর-একজন চাষীর কাছে। সে দিব্যি করে বলল, তার হাত একেবারে খালি; তবু জুতো-সারানো বাবদ দেয় কুড়ি কোপেকের ছোটঋণটা কোনোরকমে শোধ করে দেবে।

মুচি মনে মনে ভাবল, নাহয় ধারেই ভেড়ার চামড়াটা কেনা যাবে। কিন্তু চামড়ার দোকানির মুখে অন্য কথা। সে বলল, "পুরো টাকাটা দিয়ে পছন্দমতো চামড়া নিয়ে যাও। দেনা শোধ করা যে কী জিনিস সে আমি ভালোই জানি।"

সারা সকাল ঘুরে জুতো-সেলাই বাবদ কুড়ি কোপেক আর মেরামতের জন্য একজোড়া জুতো হাতে পাওয়া ছাড়া আর কিছুই তার কপালে জুটল না।

মুচির মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কুড়ি কোপেক দিয়ে মদ খেয়ে বাড়ির পথ ধরল।

সকালবেলা থেকেই তার বেশ শীত-শীত করছিল। কিন্তু এখন মদ খাবার পরে গরম কোট ছাড়াই শরীর বেশ গরম লাগছিল। এক হাতে লাঠি দিয়ে পথের বরফের টুকরাগুলোকে ঠুকতে ঠুকতে এবং অন্য হাতে মেরামতির জুতোজোড়ার ফিতে ধরে ঝোলাতে ঝোলাতে পথ চলতে লাগল মুচি। আর নিজের মনেই বলতে লাগল :

"কোট ছাড়াই বেশ তো গরম লাগছে। খেয়েছি তো একটুখানি, তাতেই তো দেখছি শিরার ভিতর যেন খই ফুটছে। তবে আর ভেড়ার চামড়ার দরকারটা কী! অবশ্যি—বাড়িতে বউ আছে। সে আবার এই নিয়ে খিটিমিটি করবে। আচ্ছা, এও তো বড় লজ্জার কথা। তুমি একজনের কাজ করে দেবে আর সে তোমাকে কলা দেখাবে। ঠিক আছে, সবুর করো বাছাধন, এক সপ্তাহের মধ্যে যদি আমার টাকা না দিয়ে যাও, তাহলে তোমার মাথার টুপি আমি খুলে নেব। মজা মন্দ নয়! ওই আর একজন—কুড়ি কোপেক যেন আমাকে ভিক্ষা দিলেন! কুড়ি কোপেকে কী হবে? দিব্যি গেলে বলল, হাত একেবারে ফাঁকা। আমিও তো বলতে পারতাম, শুধু কি তোমার হাতই ফাঁকা? আমার হাত ফাঁকা নয়? আমার তো যা-কিছু সব এই কাঁধে। তোমার খাবার তুমি ক্ষেতে ফলাও, আর আমাকে তা কিনতে হয়। ফি হপ্তায় তিন রুবলের তো রুটিই কিনতে হয়। তাও আবার কোনোদিন হয়তো বাড়ি ফিরে দেখি রুটি ফুরিয়ে গেছে; তখন আবার দেড় রুবলের ধাক্কা। কাজেই আমার যা পাওনা আমাকে দিয়ে দাও।'

এমনিধারা ভাবতে ভাবতে মুচি চলছে। রাস্তাটা মোড় ঘুরতেই একটা গির্জা, গির্জার গায়ে একটা শাদা-মতো কী যেন তার নজরে পড়ল।

তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। ভালো করে নজর করেও জিনিশটা যে কী তা সে ঠিক ঠাওর করতে পারল না। ভাবল, "দেখতে অনেকটা যেন মানুষের মতো; তবে সারাটা দেহ কেমন যেন শাদা। তাছাড়া, মানুষ ওখানে করবেই বা কী?"

আরও কাছে এগিয়ে সবটা পরিষ্কার দেখতে পেল। কী আশ্চর্য, গির্জার গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে একটা মানুষ। মৃতই হোক আর জীবিতই হোক, বসে আছে একেবারে উলঙ্গ আর নিশ্চুপ হয়ে।

মুচি ভয়ে শিউরে উঠল। ভাবল, "নিশ্চয় কেউ লোকটাকে খুন করে জামাকাপড় খুলে নিয়ে এখানে ফেলে গেছে। পালাই বাবা, কী কাজ এসব ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে!"

মুচি লোকটাকে পেরিয়ে গেল। গির্জার অপরদিকে পৌছতেই লোকটাকে আর দেখা গেল না। কিন্তু আরও খানিক এগিয়ে পিছন ফিরে চাইতেই দেখে, লোকটা যেন গির্জা থেকে সরে এসে নড়ছে আর তার দিকে তাকিয়ে আছে।

মুচি আরও ভয় পেয়ে গেল। ভাবল, "লোকটা যে কে তাই-বা কে জানে! ভালো হলে এভাবে আসবে কেন। কাছে গেলে যদি লাফিয়ে পড়ে গলা চেপে ধরে, ওর হাত থেকে ছাড়া পাওয়া শক্ত হবে। যদি তা নাও করে, সে তো আমার ঘাড়ে চাপবে। ওরকম একটা ন্যাংটো লোককে নিয়ে করবই বা কী? নিজের গায়ের সামান্য জামা-কাপড় তো ওকে খুলে দিতে পারব না! ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন।"

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল মুচি। কিছুদূর যেতে-না-যেতেই বিবেক তাকে খোঁচাতে শুরু করল। "কী করছ তুমি সাইমন? একটা মানুষ মরতে বসেছে, আর তুমি তাকে ভয় পাচ্ছ? তুমি কি এতই ধনী যে টাকা-পয়সা চুরি যাবার ভয় করছ? ধিক তোমাকে সাইমন, ধিক!"

সাইমন মুখ ঘুরিয়ে লোকটার দিকে এগিয়ে চলল।

দুই

কাছে গিয়ে খুব ভালো করে তাকাল সাইমন। লোকটি যুবক, দেখতে স্বাস্থ্যবান, শরীরের কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই, কিন্তু শীতে যেন জমে যাচ্ছে, যেন খুব ভয় পেয়েছে। কোনোরকমে হেলান দিয়ে বসে আছে, এমনকি সাইমনের দিকেও তাকাচ্ছে না, যেন দুটো চোখ তুলে তাকাবার ক্ষমতাও তার নেই।

সাইমন কাছে যেতেই, লোকটা সহসা মাথা ঘুরিয়ে দুইচোখ মেলে সাইমনের দিকে তাকাল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সাইমনেরও যেন লোকটিকে বড় ভালো লাগল। বুটজোড়া মাটিতে রেখে খুলে ফেলল গায়ের কোট।

বলল, "কথা পরে বলবে। আগে জামাটা পরে নাও। এক্ষুনি। এই নাও।"

লোকটার কনুই ধরে সাইমন তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। সাইমন দেখল, একটি একহারা পরিচ্ছন্ন দেহ, সুডৌল হাত–পা, মিষ্টি একখানি মুখ। মুচি তার কোটটা লোকটির গলায় জড়িয়ে দিল, কিন্তু সে ঠিক হাতার মধ্যে তার হাত দুখানি ঢোকাতে পারল না। সাইমন ঠিকমতো হাত ঢুকিয়ে তাকে কোটটা পরিয়ে দিয়ে বেল্ট এঁটে দিল। তারপর মাথার টুপিটা খুলে লোকটার মাথায় পরিয়ে দেবার উপক্রম করতেই তার নিজের মাথাটাই বেশ ঠাণ্ডা লাগতে লাগল। সাইমন ভাবল, "আমার মাথাটা তো টাকে ভরা, আর ওর মাথা–ভরা কোঁকড়া চুল।" তাই সাইমন টুপিটা আবার নিজের মাথায় বসিয়ে দিল।

"ওকে বরং বুটজোড়া দিই।" সাইমন বসে পড়ে বুটজোড়া তাকে পরিয়ে দিয়ে বলল, "এই তো ঠিক হয়েছে ভাই, এইবার হাঁটো, শরীরটাকে গরম করে নাও। হাঁটতে পারবে তো?"

উঠে দাঁড়িয়ে লোকটি সাইমনের দিকে তাকাল, কিন্তু কোনো কথা বলতে পারল না।

"আরে, কথা বলছ না কেন? নাও, এসো, আর যদি দুর্বল বোধ করো, আমার লাঠিটায় ভর দাও। পা–টা ঝেড়ে নাও একটু।"

লোকটি হাঁটতে শুরু করল। অনায়াসেই হাঁটতে লাগল। একটুও পিছিয়ে রইল না।

পথে যেতে যেতে সাইমন বলল, "তুমি কোথায় থাকো বলো?"

"এ–অঞ্চলে নয়।"

"সে তো জানি। এ–অঞ্চলের সব লোককে আমি চিনি। কিন্তু ওই প্রার্থনাঘরের কাছে তুমি এলে কী করে?

"বলতে পারব না।"

"কেউ তোমাকে মেরেছিল বলে মনে হচ্ছে?"

"কেউ আমাকে মারেনি। ঈশ্বর শাস্তি দিয়েছেন।"

"ঈশ্বর সব জায়গাতেই আছেন, সে তো সকলেই জানে। তুমি কোথায় যাবে?"

"আমার কাছে সব জায়গাই সমান।"

সাইমন বিস্মিত হল। লোকটি উদ্ধত নয়, তার কথাগুলো শান্ত, কিন্তু নিজের সম্পর্কে কিছুই সে বলতে চায় না। সাইমন ভাবল, "কতকিছুই তো আমরা বুঝি না।" তারপর লোকটিকে বলল :

"ঠিক আছে, নিজের আস্তানায় যাবার আগে তুমি আমার বাড়িতেই চলো।"

সাইমন হাঁটতে লাগল। লোকটিও চলল তার পাশে–পাশেই।

বাতাস উঠল। বেশ শীত করছে। স্ত্রীর জ্যাকেটটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে ভাবতে লাগল : "ভেড়ার চামড়া আমাকে কোথায় টেনে এনেছে! বেরিয়েছিলাম ভেড়ার চামড়ার খোঁজে, আর ফিরছি যখন তখন নিজের কোটটাও গায়ে নেই, বরং একটা ন্যাংটো লোককে নিয়ে চলেছি সঙ্গে

করে। মাত্রোনা আমাকে ছেড়ে কথা কইবে না !"

শেষের কথাটা মনে হতেই সাইমন ভীত হয়ে পড়ল। তবু লোকটির দিকে তাকাতেই তার মনে পড়ে গেল প্রার্থনাঘরের কাছে তার সেই চাউনির কথা। সঙ্গে-সঙ্গে মনটা খুশিতে ভরে উঠল।

তিন

সাইমনের বউ সকাল-সকাল সব কাজকর্ম শেষ করে ফেলেছে। জ্বালানির কাঠ কেটেছে, জল এনেছে, ছেলেকে খাইয়েছে, নিজেও কিছু একটু মুখে দিয়েছে, তারপর বসে বসে ভাবছে, কখন রুটি বানাবে : আজ না কাল? সে ভাবল, "সাইমন যদি দুপুরের খাবারটা খেয়ে থাকে, রাতে আর বেশি কিছু খাবে না। তাহলে যে-রুটি আছে তা দিয়ে কাল চলে যাবে।"

রুটির টুকরোটা ঘোরাতে ঘোরাতে মাত্রোনা ঠিক করল : "আজ আর রুটি বানাচ্ছি না। যা ময়দা আছে তাতে আর-একখানি মাত্র পাঁউরুটি হবে। সেটা দিয়ে শুক্রবার চালিয়ে দেব।"

রুটিটা একপাশে সরিয়ে রেখে মাত্রোনা টেবিলে বসে স্বামীর শার্টের ফুটো সেলাই করতে লাগল। সেলাই করতে করতে সে স্বামীর কথাই ভাবছিল ; ভাবছিল তার চামড়া কেনার কথা।

"চামড়ার দোকানি তাকে না-ঠকালে বাঁচি ! লোকটা আবার যা সোজা-সরল ! নিজে সে কাউকে ঠকাবে না, কিন্তু একটা ছোটছেলেও তাকে বোকা বানাতে পারে। আট রুবল তো চাট্টিখানি কথা নয় ! একটা কোটের অভাবে গত শীতে বড়ই কষ্ট গেছে। নদীতে যেতে পারি না, বেরোতে পারি না কোথাও। লোকটা যখন সবকিছু গায়ে চড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত, আমার তো গায়ে দেবার কিছুই থাকত না। আজ যদিও খুব সকালে বেরোয়নি, তবু এতক্ষণ তো তার ফিরে আসা উচিত। জানি না আবার কোথাও মজা লুটতে বসেছেন কি না !"

মাত্রোনা যখন এইসব ভাবছে তখন সিড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। সেলাইয়ের ভিতর সুঁচটা আটকে রেখে মাত্রোনা বাইরে মুখ বাড়াল। আরে ! এ যে দুজন বাড়িতে ঢুকছে—সাইমন, আর তার সঙ্গে একটি অপরিচিত মানুষ ! মাথায় টুপি নেই, পায়ে ভারী বুট।

সঙ্গে-সঙ্গে স্বামীর মুখে ভদ্‌কার গন্ধ পেল সে। তাহলে তো মজা লুটেই এসেছেন ! তার উপর এতক্ষণে নজরে পড়ল তার গায়ে কোটটাও নেই, আছে শুধু তারই জ্যাকেটটা। হাতেও কিছু নেই।

মাত্রোনার বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল। সে ভাবল, "এ তো মদ খেয়ে সব টাকা উড়িয়ে এসেছে। এই বাজে লোকটার সঙ্গে ফুর্তিফার্তা করে বাড়ি অবধি নিয়ে এসেছে ওকে।"

মাত্রোনার সামনে দিয়েই তারা ঘরে ঢুকল। ভালো করে সে দেখতে পেল আগন্তুক লোকটিকে। একটি হ্যাংলা চেহারার যুবক, গায়ে তাদেরই কোট, মাথায় টুপি নেই। কোটের নিচে শার্টও নেই। ভিতরে ঢুকে লোকটি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল, নড়ল না একটুও, চোখ তুলে তাকালও না। মাত্রোনার মনে হল লোকটা নিশ্চয় খারাপ, তাই ভয় পেয়েছে।

মাত্রোনা ভুরু কুঁচকে স্টোভের দিকে এগিয়ে গেল। দেখতে লাগল ওরা কী করে।

সাইমন টুপি খুলে বেঞ্চিটার উপর বসল, যেন কিছুই হয়নি। বলল, "আরে মাত্রোনা, রাতের খাবারটা বানাও।"

মাত্রোনা অস্ফুটভাবে কী যেন বলে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। সাইমন বুঝল বউয়ের মেজাজ বিগড়েছে, কিন্তু কিছু তো করবার নেই। আগন্তুকের হাত ধরে সে বলল, "এসো ভাই, এইখানে বস, কিছু খাওয়া যাক।"

আগন্তুক সাইমনের পাশের বেঞ্চিটাতে বসল। সাইমন উঠে গিয়ে বউকে বলল, "কী রান্না

করেছ বলো দেখি।"

মাত্রোনা রাগে ফেটে পড়ল : "রান্না করেছি, কিন্তু তোমার জন্যে নয়। মদ খেয়ে তো বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। গেলে কোট কিনতে ; ফিরে এলে নিজের কোটটাও খুইয়ে। আবার একটা ন্যাংটো রাস্তার লোককে ধরে এনেছ সঙ্গে করে। তোমাদের মতো মাতালদের জন্য আমি রান্না করিনি।"

"দেখ মাত্রোনা, অকারণে বকবক কোরো না। আগে শোনো লোকটা কেমনশুশুশুশু"

"আগে বলো, টাকা কী করেছ।"

সাইমন কোটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে নোট বের করে দেখাল।

"এই দেখ টাকা। ত্রিফোনফ্ টাকা দেয়নি, কাল দেবে বলেছে।"

মাত্রোনার রাগ আরও চড়ে গেল। কোট তো আনেইনি, আবার তাদের একটিমাত্র কোট খয়রাত করেছে একটা ন্যাংটো লোককে। তাকে বাড়ি অবধি নিয়ে এসেছে।

টেবিলের উপর থেকে টাকাটা ছোঁ মেরে নিয়ে লুকিয়ে রাখতে রাখতে সে বলল, "কিচ্ছু নেই; যত রাজ্যের ন্যাংটো মাতালদের আমি খাওয়াতে পারব না।"

"আহ্ মাত্রোনা, চুপ করো ! আগে শোনো লোকটা কে····"

"একটা বোকা মাতালের কথা আবার কী শুনব ! গেলে চামড়া কিনতে, তাও মদ খেয়ে উড়িয়ে দিলে।"

সাইমন বউকে বোঝাতে চাইল যে সে মাত্র কুড়ি কোপেকের মদ খেয়েছে, আর এই লোকটাকে কী অবস্থায় পেয়েছে—কিন্তু এক-কথা বলবার আগে বউ তাকে দশ-কথা শুনিয়ে দিল।

বকবক করতে করতে একসময় মাত্রোনা সাইমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জামার আস্তিন চেপে ধরে বলে উঠল, "শিগ্‌গির আমার জ্যাকেট দাও ! ওটাই তো আমার একমাত্র সম্বল, তাও তুমি নিয়ে নিয়েছ নিজে গায় দেবে বলে। এক্ষুনি ফিরিয়ে দাও, মাতাল, কুকুর কোথাকার ! তারপর জাহান্নামে যাও !"

সাইমন জ্যাকেটটা খুলতে চেষ্টা করতেই মাত্রোনা সেটা ধরে দিল টান। ফলে তার সেলাই গেল ছিঁড়ে। সেটাকেই টেনে নিয়ে নিজের মাথায় জড়িয়ে মাত্রোনা দরজার দিকে পা বাড়াল।

হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল। বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল তার। মাত্রোনার মনে হল, রাগ দমন করা দরকার ; এ লোকটা কে তাও জানা দরকার।

চার

মাত্রোনা থামল। বলল : "লোকটা যদি ভালোই হবে তাহলে সে এমন ন্যাংটো কেন, কেন গায়ে দেবার একটা শার্টও জোটেনি। আর তুমি যদি ভালোভাবেই ছিলে সারাদিন তাহলে এই স্যাঙাৎকে কোত্থেকে জুটিয়েছ সে-কথা এতক্ষণ খুলে বলোনি কেন ?"

সাইমন বলল, "বেশ তো, এখুনি সব বলছি। আমি হেঁটে আসছিলাম ; দেখি প্রার্থনাঘরের পাশে লোকটি বসে আছে ; গায়ে কিছু নেই, শীতে জমে গেছে। ভেবে দেখ, লোকটি একেবারে উলঙ্গ, আর এটা গরমকাল নয়। ঈশ্বরই আমাকে ওর কাছে পাঠিয়েছিলেন, নইলে সে নির্ঘাত মারা যেত। বলো, তখন আমি কী করি? আমি তাকে হাত ধরে তুললাম, জামা-জুতো পরালাম, নিয়ে এলাম এখানে। মনটাকে একটু নরম কর মাত্রোনা ; এরকম করা পাপ। মনে রেখো, আমরাও একদিন মরব।"

মাত্রোনা আবার বকুনি দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় আগন্তুকের দিকে তার চোখ পড়ল।

আগন্তুক তখনও বেঞ্চির এককোণে চুপ করে বসে আছে। দুখানি হাত রেখেছে হাঁটুর উপর, মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে বুকের উপর। চোখ-ভুরু কুঁচকে আছে, যেন ভিতর থেকে কোনোকিছু আঘাত করছে তাকে।

মাত্রোনা চুপ করে গেল।

সাইমন বলল, "মাত্রোনা, তোমার মধ্যে কি ঈশ্বরের ভয় নেই?"

এই কথা শুনে মাত্রোনা আবার আগন্তুকের দিকে চাইল। সহসা তার মনটা গলে গেল। স্টোভের কাছে গিয়ে সে খাবার তৈরি করল। টেবিলের উপর একটি ছোট বাটি রেখে তাতে ক্বাস ঢালল, রুটির শেষ টুকরোটা এনে দুজনের দিকে এগিয়ে দিল দুটো কাঁটা-চামচ।

"এবার খাও", মাত্রোনা বলল।

সাইমন আগন্তুককে ডেকে নিল টেবিলে।

"বসো হে ভালো মানুষ।"

সাইমন রুটি কেটে খেতে শুরু করল। মাত্রোনা টেবিলের একপাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল আগন্তুককে। বেচারির জন্য এবার দুঃখ হল তার।

সহসা আগন্তুক যেন খুশি হয়ে উঠল। থেমে গেল তার ভুরুর কোঁচকানি। মাত্রোনার দিকে দুচোখ তুলে তাকিয়ে সে হেসে ফেলল।

খাওয়া শেষে টেবিল পরিষ্কার করে মাত্রোনা আগন্তুককে জিজ্ঞেস করল : "তুমি কোত্থেকে আসছ?"

"এ-অঞ্চল থেকে নয়।"

"রাস্তার ধারে এলে কেমন করে?"

"বলতে পারি না।"

"তোমার সবকিছু কি কেউ চুরি করেছিল?"

"ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দিয়েছেন।"

"তাই কি তুমি ন্যাংটো হয়ে সেখানে পড়েছিলে?"

"তাই আমি সেখানে পড়ে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিলাম। সাইমন আমাকে দেখতে পেল; দয়া হল তার, কোট খুলে আমাকে পরিয়ে দিল। আসতে বলল এখানে। এখানে এলে তুমি আমাকে খাদ্য দিলে, পানীয় দিলে, আমাকে দয়া করলে। ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করুন।"

মাত্রোনা উঠে দাঁড়াল। সাইমনের যে-শার্টটা সে সেলাই করছিল সেটা জানালার তাক থেকে তুলে নিয়ে আগন্তুককে দিল। খুঁজে-পেতে এনে দিল একটা ট্রাউজারও।

"তোমার তো শার্ট নেই। এইগুলো পরে ঐ তাকের উপরে বা স্টোভের উপরে যেখানে খুশি শুয়ে পড়ো।"

আগন্তুক গায়ের কোটটা খুলে শার্ট ও ট্রাউজার পরে তাকের উপরে শুয়ে পড়ল। মাত্রোনা বাতি নিভিয়ে দিয়ে কোটটা নিয়ে স্বামীর পাশে শুল।

তার মনে পড়ল, রুটির শেষ টুকরোটাও তারা খেয়ে ফেলেছে। কালকের জন্য কিছুই নেই। মনে পড়ল, শার্ট আর ট্রাউজার দুটোই সে দান করেছে। অমনি তার মন খারাপ হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গেই মনে পড়ল আগন্তুকের হাসিটি; অমনি মন খুশি হয়ে উঠল আবার।

মাত্রোনা অনেকক্ষণ জেগে রইল। একসময় তার খেয়াল হল সাইমনও ঘুমোয়নি।

"সাইমন!"

"উ!"

"রুটির শেষ টুকরোটাও আমরা খেয়ে ফেলেছি। কালকের জন্য কিছু বানিয়েও রাখিনি

কাল কী হবে আমি জানি না। প্রতিবেশীর কাছে কিছু ধার চাইতে হবে।"

"আমরা বেঁচে থাকব ; খেতেও পাব।"

বউটি চুপ করে রইল।

"যাই হোক, লোকটি নিশ্চয়ই ভালো; তবে, নিজের সম্বন্ধে কিছুই বলে না এই যা।"

"কথা বলার তার দরকার নেই।"

"সাইমন !"

"উঁ !"

"আমরা তো দিলাম, কিন্তু আমাদের কেউ কিছু দেয় না কেন?"

কী জবাব দেবে সাইমন জানে না। সে বলল, "পরে কথা হবে।"

সে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

পাঁচ

পরদিন সকালে সাইমনের ঘুম ভাঙল। ছেলেমেয়েরা তখনও ঘুমুচ্ছে। বউ গেছে প্রতিবেশীর বাড়ি রুটি ধার করতে। পুরানো ট্রাউজার আর শার্ট পরে আগন্তুক উপরের দিকে তাকিয়ে বেঞ্চিতে বসে আছে। তার মুখখানি আজ কালকের চাইতেও উজ্জ্বল।

সাইমন বলল, "দেখ ভাই, পেট চায় খাবার, আর শরীর চায় জামা-কাপড়। প্রত্যেককেই উপার্জন করতে হবে। তুমি কী কাজ জানো?"

"আমি কিছুই জানি না।"

সাইমন বিস্মিত হয়ে বলল, "ইচ্ছা থাকলে মানুষ সবকিছু শিখতে পারে।"

"মানুষ কাজ করে ; আমিও কাজ করব।"

"তোমার নাম কী?"

"মিখাইল।"

"দেখ মিখাইল, নিজের সম্পর্কে তুমি কিছুই বলতে চাও না, সে তোমার খুশি। কিন্তু উপার্জন তো তোমাকে করতেই হবে। আমি যা কাজ দিই তা করবে। তাহলে আমি তোমাকে খেতে দেব।"

"ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। নিশ্চয়ই শিখব। বলে দাও কী করতে হবে।"

সাইমন দেখিয়ে দিল কেমন করে সেলাই করতে হয়। মিখাইল বেশ তাড়াতাড়ি সেটা রপ্ত করে নিল। মোটা সুতো দিয়ে কী করে সেলাই করতে হয় মিখাইল শিখে ফেলল তাও।

সাইমন যা-কিছু দেখায় তাই সে শিখে ফেলে। তিনদিনের দিন থেকে সে এমনভাবে সেলাইয়ের কাজ করতে লাগল যেন সারাজীবন সে সেলাই করে আসছে। তার কাজে কখনও ভুল হয় না। সে খায়ও কম। শুধু মাঝে-মাঝে একটু বিশ্রাম নেয়, আর সেই সময়টা আকাশের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকে। কখনও সে ঘর ছেড়ে বাইরে যায় না ; একটি বাজে কথা বলে না; হাসিঠাট্টাও করে না।

প্রথমদিন সন্ধ্যায় মাত্রোনা যখন তার জন্যে খাবার তৈরি করছিল কেবলমাত্র সেই দিন তারা তাকে একবার হাসতে দেখেছিল।

ছয়

দিন যায়, সপ্তাহ যায়, ধীরে ধীরে বছরও শেষ হয়ে আসে। এখন মিখাইলের মতো সুন্দর আর মজবুত জুতো আর কেউ সেলাই করতে পারে না। সারা জেলার লোক জুতোর জন্য সাইমনের

বাড়ি আসতে লাগল। ফিরে গেল তার বরাত।

একদিন শীতকালে সাইমন বসে মিখাইলের সঙ্গে কাজ করছে, এমন সময় তিন–ঘোড়ার একখানি ঘণ্টা–বাঁধা স্লেজগাড়ি তার কুঁড়ের দরজায় এসে দাঁড়াল। একটি ছোটছেলে কোচয়ানের আসন থেকে লাফ দিয়ে নেমে খুলে দিল গাড়ির দরজা। ফারকোট গায়ে একজন ভদ্রলোক স্লেজ থেকে নেমে সাইমনের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। মাত্রোনা ছুটে গিয়ে খুলে দিল দরজা। মাথা নিচু করে তিনি ঘরে ঢুকলেন। আবার যখন মাথা উঁচু করলেন তখন মাথা প্রায় ছাদ ছোঁয়–ছোঁয়। ঘরের একটা কোণই তিনি দখল করে ফেললেন প্রায়।

সাইমন উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার দিয়ে হাঁ করে ভদ্রলোককে দেখতে লাগল। এরকম মানুষ সে এর আগে কখনও দেখেনি। সাইমন নিজে রোগা, মিখাইলও তাই ; মাত্রোনা তো একগাছি শুকনো লাঠির মতো দেখতে। কিন্তু ইনি—যেন অন্য জগতের লোক ; ফোলা–ফোলা লাল মুখ, ষাঁড়ের মতো ঘাড়, ঢালাই লোহা দিয়ে গড়া দেহ।

ভদ্রলোক হাঁপাতে লাগলেন। গায়ের কোট খুলে বেঞ্চিতে বসে বললেন : "বড় মুচি কে?"

সাইমন সামনে এগিয়ে বলল : "আজ্ঞে আমি।"

ভদ্রলোক চাকরটাকে চেঁচিয়ে বললেন : "এই—ফেড্‌কা, চামড়াটা নিয়ে আয়।"

ছেলেটা দৌড়ে একটা বান্ডিল নিয়ে এল। ভদ্রলোক বান্ডিলটা নিয়ে টেবিলের উপর রাখলেন।

চামড়াটা দেখিয়ে ভদ্রলোক সাইমনকে বললেন, "দেখ মুচি, বেশ মন দিয়ে শোনো। এটা দেখতে পাচ্ছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"জিনিশটা কেমন ঠিক বুঝতে পারছ?"

সাইমন হাত দিয়ে ছুঁয়ে বলল : "ভালো চামড়া।"

"ভালোই বটে ! বোকারাম, এমন চামড়া তুমি জীবনে দেখ নি ! এটা জার্মানির জিনিশ দাম কুড়ি রুবল।"

সাইমন ভয় পেয়ে বলল : "এমন জিনিশ আমরা কোথায় দেখব !"

"সে যাহোক। এই চামড়া দিয়ে তুমি আমাকে নতুন জুতো তৈরি করে দিতে পারবে কি?"

"আজ্ঞে পারব।"

ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন : "শুধু পারব বললেই হল না। কী জিনিস সেলাই করতে হবে বুঝতে পারছ কি? আমাকে এমন জুতো তৈরি করে দিতে হবে যা একবছরের মধ্যে ছিড়বে না, কুঁচকাবে না, বা সেলাই খুলে যাবে না। যদি পারো, চামড়াটা নিয়ে কাটাকুটি কোরো; যদি না পারো নিয়ো না, কেটো না। আমি আগেই বলে রাখছি, একবছরের আগে যদি জুতোর সেলাই ছেঁড়ে বা জুতো দুমড়ে যায়, আমি তোমাকে জেলে দেব ! আর একবছরের মধ্যে যদি না–ছেঁড়ে বা না–কুঁচকে যায়, তাহলে তোমাকে মজুরি দেব দশ রুবল।"

সাইমন ভয় পেয়ে গেল। মিখাইলের দিকে তাকিয়ে তাকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল : "ভাই, কী করি?"

মিখাইল মাথা নেড়ে বলল : "কাজটা নিয়ে নিন।"

ভদ্রলোক চাকরটাকে চেঁচিয়ে ডেকে বাঁ–পায়ের বুট খুলতে বললেন। তারপর পা–টা বাড়িয়ে দিলেন।

"মাপ নাও।"

সাইমন আঠারো ইঞ্চি লম্বা একখানা কাগজ সেলাই করে সেটা বেশ ভালো করে মুছে নিয়ে

হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর মাপ নিতে আরম্ভ করল। পায়ের তলা মাপল, পাতার উপরটা মাপল, তারপর পায়ের গুলি মাপতে গেল। কিন্তু কাগজটা ততদূর পৌঁছল না। সেই বিরাট পায়ের গুলিটা একটা গাছের গুঁড়ির মতো।

বাইরে তখন অনেক লোক উঁকিঝুঁকি মারছে।

ভদ্রলোকের নজর পড়ল মিখাইলের উপর।

"ও কে? ও কি তোমার লোক?"

"ও আমার কারিকর। ও-ই তো জুতো সেলাই করবে।"

ভদ্রলোক মিখাইলকে বললেন : "দেখ হে, মনে রেখো এমনভাবে সেলাই করতে হবে যেন একবছরের মধ্যে কিছু না হয়।"

সাইমন মিখাইলের দিকে তাকাল। মিখাইল তখন ভদ্রলোকের দিকে না-তাকিয়ে তাঁর পিছনে ঘরের কোণে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ সে মৃদু হেসে উঠল, আর তার সারাশরীর ঝলমল করে উঠল।

"হাঁ করে দেখছ কী বোকারাম? বরং নজর রেখো জুতো যেন ঠিক সময় তৈরি হয়।"

মিখাইল বলল : "ঠিক যে-সময়ে দরকার হবে তখনি তৈরি পাবেন।"

"তাহলেই হল।"

বুট পায়ে দিয়ে ফারকোট গায়ে দিয়ে ভদ্রলোক দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু মাথা নিচু করতে ভুল হওয়ায় তার মাথাটা লিন্টেলের সঙ্গে ঠোক্কর খেল।

কিছুক্ষণ শাপমন্যি করে মাথা ঘষতে ঘষতে ভদ্রলোক স্লেজে চেপে চলে গেলেন।

যাবার পর সাইমন বলল : "ব্যাটা যেন পাহাড়! মাথায় লেগে দরজাটা জখম হল, কিন্তু ওর কিছুই হল না।"

মাত্রোনা বলল : "ওদের যেমন জীবন তাতে শক্তপোক্ত তো হবেই! এরকম লোহার মানুষকে মৃত্যুও ছুঁতে পারে না।"

সাত

সাইমন মিখাইলকে বলল :

"কাজটা যখন নিয়েছি, দেখো যেন কোনোরকম গোলমালে না পড়ি। চামড়াটা দামি, ভদ্রলোকও বদমেজাজি। দেখতে হবে যাতে কোনো ভুল না হয়। তোমার হাতও এখন আমার হাতের চেয়ে পাকা। মাপজোকগুলো নিয়ে চামড়াটা তুমিই কাটো, আমি বরং উপরের চামড়াটা সেলাই করব।"

সেই কথামতো মিখাইল ভদ্রলোকের চামড়াটা নিয়ে টেবিলের উপরে পাতল। দুই ভাঁজ করে কাঁচি নিয়ে শুরু করল কাটতে।

ঘরে ঢুকল মাত্রোনা। মিখাইলের চামড়া কাটা দেখে সে অবাক হয়ে গেল। মুচির কাজ মাত্রোনাও ভালো বোঝে। সে দেখল, মিখাইল চামড়াটা বুটের মতো করে না-কেটে গোল-গোল টুকরো করে কাটছে। কিছু বলতে গিয়েও মাত্রোনা ভাবল : "হয়তো ভদ্রলোকদের বুট কেমন করে বানায় আমি জানি না। মিখাইল নিশ্চয় আমার থেকে ভালো জানে।"

কাটা শেষ করে মিখাইল সুতো নিয়ে সেলাই করতে শুরু করল।

মাত্রোনা আবারও অবাক, কিন্তু এবারও সে কিছু বলল না। মিখাইল সেলাই করেই চলল।

বেলা দুপুর হলে সাইমন উঠে দাঁড়িয়ে চোখ ফেরাল। এ কী! ভদ্রলোকের চামড়াটা দিয়ে মিখাইল যে একজোড়া চটি তৈরি করে ফেলেছে!

সাইমন আর্তনাদ করে উঠল। ভাবল : "আজ একবছর মিখাইল এখানে আছে, কোনোদিন একটা ভুল করেনি, আজ সে এমন মারাত্মক ভুল কেমন করে করল? ভদ্রলোক অর্ডার দিয়ে গেলেন উঁচু বুটের, আর ও তৈরি করে বসেছে চটিজুতো! ভদ্রলোককে আমি মুখ দেখাব কেমন করে?

সে মিখাইলকে বলল : "এ তুমি কী করেছ ভাই? ভদ্রলোক-যে অর্ডার দিয়ে গেলেন বুটের?"

সাইমন সবে কথা বলতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল। সাইমন ও মিখাইল জানালা দিয়ে তাকাল। ঘোড়ায় চড়ে একটি লোক এসেছে।

তারা দরজা খুলে দিল। সেই ভদ্রলোকের একটি চাকর ঢুকল ভিতরে।

"কর্ত্রী আমাকে পাঠালেন সেই বুটের ব্যাপারে।"

"বুটের আবার কী হল?"

"কী হলই বটে! আমার মনিবের আর বুটের দরকার নেই। তিনি মারা গেছেন।"

"বলো কী!"

"এখান থেকে তিনি বাড়িও ফেরেননি, স্লেজের মধ্যেই মারা গেছেন। আমরা যখন বাড়ি পৌছলাম, সকলে তাঁকে ধরাধরি করে নামাতে এল; কিন্তু তিনি একটা বস্তার মতো গড়িয়ে পড়লেন। তাঁকে স্লেজ থেকে নামিয়ে আনতে-না-আনতেই কর্ত্রী আমাকে ডেকে বললেন : 'মুচিকে বলবে, একজন ভদ্রলোক চামড়া জমা দিয়ে একজোড়া বুটের অর্ডার দিয়েছিলেন, সে-বুট আর দরকার নেই, বরং যত শীঘ্র সম্ভব সেই চামড়া দিয়ে শবাধারের জন্য একজোড়া চটি যেন তৈরি করে দেয়। যতক্ষণ তৈরি না হয় অপেক্ষা করে চটি নিয়ে তবে আসবে।' তাই আমি এসেছি।"

মিখাইল টেবিল থেকে টুকরো চামড়াগুলো নিয়ে গোল পাকাল, তৈরি-চটিজোড়া একসঙ্গে বেঁধে অ্যাপ্রন দিয়ে ভালো করে মুছে সেগুলি দিয়ে দিল ছেলেটাকে। ছেলেটা হাত পেতে চটিজোড়া নিল।

"বিদায়, মশায়রা! শুভদিন!"

আট

আরও একবছর কেটে গেল। এখন সাইমনের বাড়িতে দুবছর পূর্ণ হল মিখাইলের। সে ঠিক আগের মতোই আছে। কখনও কোথাও যায় না, একটা বাজে কথা বলে না। এতদিনের মধ্যে মাত্র দুবার হেসেছে : একবার, যখন স্ত্রীলোকটি তার জন্য রাতের খাবার তৈরি করেছিল, দ্বিতীয়বার সেই ভদ্রলোককে দেখে। লোকটিকে নিয়ে সাইমনেরও খুশির সীমা নেই। কোথা থেকে সে এসেছে, সে আর জিজ্ঞেস করে না। তার একমাত্র ভয়, পাছে মিখাইল চলে যায়।

একদিন, দুজনই বাড়িতে। মুচির বউ উনুনে পাত্র চাপাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা বেঞ্চির পাশে দৌড়োদৌড়ি করছে আর জানালা দিয়ে দেখছে মাঝেমাঝে। একটা জানালার পাশে বসে সাইমন সেলাই করছে। আরেকটা জানালার পাশে বসে মিখাইল জুতোর গোড়ালিতে কাঁটা মারছে।

সাইমনের ছোটছেলে দৌড়ে এসে মিখাইলের ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ে জানালা দিয়ে তাকাল।

"মিখাইলকাকা, দেখ, ছোট-ছোট মেয়েদের নিয়ে একজন বণিকের স্ত্রী এই দিকেই আসছে। একটি ছোটমেয়ে আবার খোঁড়া।"

সঙ্গে সঙ্গে মিখাইল হাতের কাজ রেখে জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে সেদিকে তাকাল।

সাইমন অবাক হয়ে গেল। এর আগে মিখাইল তো কখনও রাস্তার দিকে তাকায়নি! অথচ এখন সে কী যেন দেখবার জন্য জানালার একেবারে ধার ঘেঁষে বসেছে। সাইমনও জানালা দিয়ে তাকাল। দেখল, পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরা একটি স্ত্রীলোক তার বাড়ির দিকেই আসছে। দুটি মেয়েকে সে হাত ধরে নিয়ে আসছে। দুটি মেয়ে দেখতে একেবারে একরকম। দুজনেরই ফারকোট আর গরম স্কার্ফ গায়ে। দুজনকে আলাদা করাই মুশকিল, শুধু একজনের পা একটু বাঁকা, সে খুঁড়িয়ে হাঁটে।

স্ত্রীলোকটি সিঁড়ি বেয়ে উঠে হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলল এবং মেয়েদুটিকে সামনে রেখে ঘরের ভিতরে পা দিল।

"নমস্কার।"

"আসুন। কী চাই আপনার?"

স্ত্রীলোকটি বসল টেবিলের পাশে। মেয়েদুটি তার হাঁটু ঘেঁষে দাঁড়াল।

স্ত্রীলোকটি বলল, "এই মেয়েদের বসন্তকালে পরবার মতো চামড়ার জুতো চাই।"

"ভালো কথা, করে দেব। এত ছোট জুতো এর আগে আমরা করিনি, কিন্তু সবরকমই আমরা করতে পারি। আগাগোড়া চামড়ার জুতোও করাতে পারেন, আবার কাপড়ের লাইনিং দেওয়াও করাতে পারেন। এই আমার বড় কারিকর মিখাইল।"

সাইমন মিখাইলের দিকে তাকাল। সে তখন হাতের কাজ রেখে মেয়েদুটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে।

সাইমন খুবই বিস্মিত হল। এ-কথা ঠিক যে মেয়েদুটি দেখতে খুব সুন্দর। কালো চোখ, গোলগাল লাল টুকটুকে শরীর। গায়ের কোট আর স্কার্ফও সুন্দর। কিন্তু মিখাইল কেন-যে একান্ত পরিচিতের মতো তাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে কিছুতেই বুঝতে পারল না।

যাহোক সাইমন স্ত্রীলোকটির সঙ্গে দরদাম করতে লাগল। খোঁড়া মেয়েটাকে কোলের উপর তুলে স্ত্রীলোকটি বলল : "এর দু-পায়ের মাপ নাও; একপাটি জুতো করো খোঁড়া পায়ের মাপে, আর তিন-পাটি করো ভালো পায়ের মাপে। তাহলেই হবে। এদের দুজনের পা ঠিক এক মাপের। এরা যমজ।"

মাপ নেবার পর সাইমন বলল, "আহা, এমন সুন্দর মেয়েটি, এরকম কেমন করে হল? জন্মের থেকেই কি এই রকম?"

"না, ওর মা-ই পা-টা ভেঙে ফেলেছিল।"

এই সময় মাত্রোনা ঘরে ঢুকে বলল, "আপনি তাহলে ওদের মা নন?"

"না গো ভালোমানুষের মেয়ে, আমি ওদের মা নই, কোনোরকম আত্মীয়ও নই। এদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্কই নেই। আমি ওদের লালন-পালন করেছি মাত্র।"

"আপনার মেয়ে নয়, অথচ আপনি ওদের এত ভালোবাসেন!"

"ভালো না-বেসে কী করি? এদের দুজনকেই যে আমার বুকের দুধ খাইয়ে বড় করেছি। আমার নিজের একটি সন্তান ছিল, ঈশ্বর তাকে নিয়ে নিলেন। এদের যত ভালোবাসি তত ভালো বুঝি সেটাকেও বাসতাম না।"

"এরা তাহলে কার মেয়ে?"

স্ত্রীলোকটি বলতে আরম্ভ করল।

"ছ-বছর আগেকার কথা। একসপ্তাহের মধ্যে এরা বাবা-মাকে হারাল; বাপকে কবর দেওয়া হল মঙ্গলবার, মা মারা গেল শুক্রবার। জন্মের তিনদিন আগে বাপকে হারাল, মা মারা গেল জন্মের দিন। তখন আমার স্বামী আর আমি চাষবাসের কাজ করি। আমরা ছিলাম তাদের

প্রতিবেশী ; পাশের বাড়িই ছিল আমাদের ! ওদের বাবাও একজন চাষী, জঙ্গলে কাজ করত। কেমন করে যেন একটা গাছ তার উপরে পড়ে ; শরীরের একেবারে আড়াআড়ি। ফলে ভিতরটা একেবারে গুঁড়ো হয়ে যায়। তাকে যখন বাড়ি নিয়ে এল, তখন সব শেষ। সেই সপ্তাহেই তার স্ত্রীর দুটি যমজ মেয়ে হল, এই দুটি মেয়ে। দুঃখে-দুর্দশায় সে ছিল একেবারে একা—যুবতী বা বৃদ্ধা কোনো আত্মীয়াই ছিল না। একাই সে শিশুদের জন্ম দিল, একাই মারা গেল।

"পরদিন সকালে আমি তাকে দেখতে গেলাম। ওর বাড়ি পৌঁছে দেখি বেচারি তখন মরে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মরবার ঠিক আগে সে পাশ ফিরে একটা মেয়ের উপর গড়িয়ে পড়ে। তাতেই ওর বাঁ-পা গুঁড়িয়ে বেঁকে যায়। লোকজন জড়ো হয়ে তাকে ধোয়াপোঁছা করে, পোশাক পরিয়ে কফিন তৈরি করে কবর দেবার ব্যবস্থা করল। মেয়েদুটি একা পড়ে গেল। কোথায় তাদের রাখা হবে ? তখন একমাত্র আমার কোলেই সন্তান ছিল; আমার সেই ছেলের বয়স তখন আট সপ্তাহ। কাজেই তখনকার মতো আমিই তাদের ভার নিলাম। সুস্থ মেয়েটাকে বুকের দুধ খাওয়াতে লাগলাম। প্রথমটা পা-ভাঙা মেয়েটাকে দুধ দিইনি, ও যে বাঁচবে তা ভাবিনি। পরে ভাবলাম : এমন পরীর মতো মেয়েটা কেন মারা যাবে ? আমার মনে দয়া হল। তাকেও দুধ দিতে লাগলাম। আমার তখন বয়স অল্প, স্বাস্থ্য ভালো, ভালো খাওয়াদাওয়া করতাম। ঈশ্বরও বুকে এত দুধ দিতেন যে অনেক সময় উপচে পড়ত। একসঙ্গে দুজনকে খাওয়াতাম, তৃতীয়জন অপেক্ষা করত। একজন থামলে তখন তৃতীয়টিকে খাওয়াতাম। ঈশ্বরের বুঝি ইচ্ছা যে আমি এই দুটোকেই মানুষ করি, তাই দ্বিতীয় বছরেই আমরা নিজেরটিকে কবরে শুইয়ে দিলাম। ঈশ্বর আমাকে আর সন্তান দিলেন না, কিন্তু আমাদের অবস্থা ফিরতে লাগল। এখন আমরা মিলের মালিক হয়েছি। আমাদের আয় যথেষ্ট, থাকিও ভালোভাবে। নিজেদের ছেলেপিলে নেই, এই দুটিকে না-পেলে কী নিয়ে আমি বাঁচতাম ! ওদের ভালো না-বেসে কি আমি পারি ! ওরাই তো আমার প্রদীপের সলতে।"

মাত্রোনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : "এইজন্যই বুঝি লোকে বলে : বাপ-মা ছাড়া তুমি বাঁচতে পারো, কিন্তু ঈশ্বরকে ছেড়ে বাঁচতে পারো না।"

কথাবার্তা শেষ করে স্ত্রীলোকটি যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। মুচি আর তার বউ দরজা পর্যন্ত গেল তাদের সঙ্গে। তারপর মিখাইলের দিকে তাকাল। হাঁটুর উপরে দুই হাত ভাঁজ করে সে বসে আছে। চেয়ে আছে উপরের দিকে। হাসছে।

নয়

সাইমন তার কাছে গিয়ে বলল : "এইবার সব কথা খুলে বলো তো মিখাইল।"

হাতের কাজ সরিয়ে রেখে মিখাইল বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াল। অ্যাপ্রনটা খুলে মুচি আর তার বউকে নমস্কার করে বলল : "তোমরা দুজনে আমাকে ক্ষমা করো। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করেছেন। তোমরাও ক্ষমা করো।"

উভয়ে দেখতে পেল, মিখাইলকে ঘিরে একটা আলো ঝলমল করছে। সাইমন দাঁড়িয়ে মিখাইলকে নমস্কার জানিয়ে বলল : "বুঝলাম মিখাইল, তুমি সাধারণ মানুষ নও, তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করাও চলে না। শুধু একটা কথা বলো : প্রথম সাক্ষাতের পরে তোমাকে যখন বাড়ি নিয়ে আসি তখনই বা তুমি বিষণ্ণ ছিলে কেন, আবার আমার স্ত্রী যখন তোমাকে রাতের খাবার পরিবেশন করল তখনই বা তুমি হাসলে কেন? তারপর, সেই ভদ্রলোক যখন বুটের অর্ডার দিলেন, তখনই তুমি দ্বিতীয়বার হাসলে কেন? এবং এইমাত্র স্ত্রীলোকটি যখন মেয়েদুটিকে নিয়ে এল তখনই বা তুমি তৃতীয়বার হাসলে কেন? বলো মিখাইল, তোমার

চারদিকে এমন আলো কেন, আর কেনই বা তুমি তিনবার হেসেছ?"

মিখাইল বলল : "আমার শাস্তি হয়েছিল, কিন্তু এখন ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করেছেন, তাই এই আলো। আমি তিনবার হেসেছি, কারণ তিনটি ঐশ্বরিক সত্য আমার জানবার ছিল। ঈশ্বরের সেই সত্য আমি জেনেছি। প্রথম সত্য জানলাম যখন তোমার স্ত্রী আমার প্রতি করুণা করল ; তাই আমি প্রথমবার হাসলাম। আরেকটি সত্য জানলাম যখন ধনীলোকটি বুটের অর্ডার দিল, তাই দ্বিতীয়বার হাসলাম। এখন এই মেয়েদুটিকে দেখে আমি তৃতীয় এবং শেষ সত্যটি জানলাম। তাই তৃতীয়বার হাসলাম।"

সাইমন বলল : "বলো মিখাইল, কেন ঈশ্বর তোমাকে শাস্তি দিয়েছিলেন, আর ঈশ্বরের সত্য তিনটিই বা কী? সব আমি জানতে চাই।"

মিখাইল বলল : "ঈশ্বরের আদেশ আমি অমান্য করেছিলাম, তাই তিনি আমাকে শাস্তি দিয়েছিলেন। আমি ছিলাম স্বর্গের দেবদূত। ঈশ্বরকে আমি অমান্য করেছিলাম।

"আমি স্বর্গের দেবদূত ছিলাম। ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছিলেন একটি স্ত্রীলোকের আত্মা নিয়ে যেতে। পৃথিবীতে উড়ে গিয়ে দেখলাম একটি স্ত্রীলোক অসুস্থ হয়ে একাকী শুয়ে আছে। সবেমাত্র তার দুটি যমজ সন্তান জন্মেছে—দুটি মেয়ে! মেয়েদুটি মায়ের পাশে পড়ে আছে, ওদের-যে দুধ খাওয়াবে সে-শক্তিও প্রসূতির নেই। স্ত্রীলোকটি আমাকে দেখতে পেল, বুঝতে পারল তার আত্মা নিতেই আমি এসেছি। চোখের জল ফেলে সে বলল : 'ঈশ্বরের দূত! আমার স্বামী গাছ-চাপা পড়ে মারা গেছে; সবাই মিলে সবে তাকে কবর দিয়েছে। আমার বোন নেই, খালা-চাচি নেই, দাদি-নানি নেই; বাপ-মা-মরা মেয়েদুটোকে দেখবার কেউ নেই। আমার আত্মা নিয়ো না। মেয়েদুটোকে খাইয়ে-পরিয়ে তাদের পায়ে দাঁড়াবার মতো করে তুলতে দাও। বাপ-মা ছাড়া তো সন্তান বাঁচতে পারে না।' প্রসূতির কথা শুনে আমি একটি মেয়েকে তার বুকে তুলে দিলাম, আরেকটিকে তুলে দিলাম তার কোলে, তারপর স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে চললাম। ঈশ্বরের কাছে উড়ে গিয়ে বললাম : 'সদ্যপ্রসূতির আত্মা আনতে আমি পারিনি। গাছ-চাপা পড়ে বাপ মরেছে; মায়ের দুটি যমজ সন্তান জন্মেছে; সে আমাকে অনুরোধ করল তার আত্মা না-নিতে। সে বলল : 'আমার মেয়েদের লালন-পালন করতে দাও, তাদের পায়ে দাঁড়াবার মতো সময় দাও। বাপ-মা ছাড়া শিশু-সন্তান বাঁচতে পারে না।'···সে মায়ের আত্মা আমি আনি নি।" তখন ঈশ্বর বললেন : 'যাও মায়ের আত্মা নিয়ে এসো, আর তিনটি সত্য জেনে এসো; জেনে এসো মানুষের কী আছে, মানুষের কী নেই, আর মানুষ কী নিয়ে বাঁচে। এই তিন সত্য জেনে তবে স্বর্গে ফিরে আসবে।' আমি আবার পৃথিবীতে উড়ে গেলাম, মায়ের আত্মা নিয়ে এলাম।"

"শিশুদুটি মায়ের বুক থেকে গড়িয়ে পড়ল। তার মৃতদেহ শয্যার উপরে ঘুরে পড়তেই একটি মেয়েকে চাপা দিল ; তার পা গেল বেঁকে। আত্মা নিয়ে ঈশ্বরের কাছে উড়ে চলেছি এমন সময় আমি ঝড়ে পড়লাম, আমার পাখাদুটো খসে পড়ল। আত্মা একাই ঈশ্বরের দিকে চলে গেল। আমি পৃথিবীতে একটি পথের ধারে পড়ে গেলাম।"

সাইমন ও মাত্রোনা বুঝতে পারল কাকে তারা খাইয়েছে, পরিয়েছে ; কে তাদের সঙ্গে এতদিন ছিল। তখন ভয়ে ও আনন্দে তারা কাঁদতে লাগল।

দেবদূত বলল : "মাঠের মধ্যে উলঙ্গ অবস্থায় আমি একা পড়ে রইলাম। মানুষের কী দরকার আমি জানতাম না। শীত বা ক্ষুধা কাকে বলে তাও জানতাম না। কিন্তু তখন আমি মানুষ হয়ে গিয়েছি। আমি তখন ক্ষুধায় কাতর, ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি ; কিন্তু কী যে করব কিছুই জানি না। তখন মাঠের মধ্যে তৈরি একটি ঈশ্বরের প্রার্থনাঘর দেখতে পেয়ে আশ্রয়ের আশায় সেখানেই গেলাম। প্রার্থনাগৃহ তালাবন্ধ। ভিতরে ঢুকতে পারলাম না। ঠাণ্ডা বাতাস থেকে আত্মরক্ষার জন্য

প্রার্থনাগৃহের পিছনে বসে রইলাম। সন্ধ্যা নেমে এল। আমি অভুক্ত, ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি, সারা শরীর কাঁপছে। হঠাৎ একটা শব্দ শুনলাম : একটা লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে, হাতে একজোড়া বুট ; নিজের মনেই কী যেন বলছে। মানুষের মরণশীল মুখ আমি দেখলাম। সে-মুখ দেখে আমার ভয় হল। চোখ ফিরিয়ে নিলাম। আমি শুনতে পেলাম লোকটি বলছে, এই বরফের মতো ঠাণ্ডায় কী করে সে নিজের শরীরকে বাঁচাবে, কেমন করে তার স্ত্রী-পুত্রকে খাওয়াবে। আমি ভাবলাম : 'ঠাণ্ডায় ও ক্ষুধায় আমি মরে যাচ্ছি, আর এই লোকটা শুধু নিজের কথাই ভাবছে ; কেমন করে নিজেকে আর বউকে ফারকোট দিয়ে ঢাকবে, কেমন করে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে খাওয়াবে। এ কখনও আমাকে সাহায্য করবে না।' লোকটি আমাকে দেখল, ভুরু কোঁচকাল, যেন আরও ভয় পেয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমি হতাশায় ভেঙে পড়লাম। হঠাৎ শব্দ শুনে বুঝলাম লোকটা ফিরে আসছে। আমি চোখ তুললাম, কিন্তু দেখলাম এ যেন সে-লোক নয়। তখন তার মুখে ছিল মৃত্যুর ছায়া, এখন সহসা সে যেন বেঁচে উঠেছে, তার মুখে আমি ঈশ্বরকে দেখতে পেলাম। সে আমার কাছে এল, আমাকে জামা-জুতো পরাল, সঙ্গে করে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। লোকটির বাড়িতে ঢুকতেই তার বউ এগিয়ে এসে বক্‌বক্‌ করতে লাগল। বউটি যেন লোকটির চাইতেও ভয়ংকরী—তার মুখ দিয়ে যেন একটি মৃত আত্মা কথা বলছে, মৃত্যুর দুর্গন্ধে আমার যেন দম আটকে আসছিল। সেই ঠাণ্ডায় সে আমাকে বাইরে তাড়িয়ে দিতে চাইল। আমি জানতাম, আমাকে তাড়িয়ে দিলেই সে মারা যাবে। তখন তার স্বামী তাকে ঈশ্বরের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটির মনে পরিবর্তন এল। তারপর সে যখন খাবার দিয়ে আমার দিকে তাকাল, আমি দেখলাম—তার মুখে মৃত্যুর ছায়া আর নেই; সে যেন বেঁচে উঠেছে ; তার মুখেও আমি ঈশ্বরকে দেখতে পেলাম।

"তখনই আমার মনে পড়ে গেল ঈশ্বরের প্রথম কথা : 'জেনে এসো, মানুষের কী আছে।' আমি জানলাম, মানুষের প্রেম আছে। আমি খুশি হলাম, কারণ ঈশ্বর আমাকে যা বলেছিলেন সেই সত্য আমার কাছে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছেন। সেই আমি প্রথমবার হাসলাম। কিন্তু সবকিছু তখনও শেখা হয়নি। তখনও জানিনি, মানুষের কী নেই, বা মানুষ কী নিয়ে বেঁচে থাকে।

"তোমাদের সঙ্গে একটি বছর কাটালাম। তারপর একদিন একজন লোক এসে এমন বুটের অর্ডার দিল যা একবছরের মধ্যে ছিঁড়বে না বা ফাটবে না। তার দিকে তাকাতেই তার পিছনে আমার সঙ্গী মৃত্যুদূতকে দেখতে পেলাম। বুঝলাম, সূর্যাস্তের আগেই সে এই ধনীলোকটির আত্মা নিয়ে যাবে। তখন ভাবলাম : 'মানুষ একবছরের কথা ভাবে, অথচ সে জানে না যে সন্ধ্যা পর্যন্তও তার আয়ু নেই।" তখনই মনে পড়ল ঈশ্বরের দ্বিতীয় কথা: 'জেনে এসো, মানুষের কী নেই।'

"মানুষের কী আছে আমি আগেই জেনেছি। এখন জানলাম, মানুষের কী নেই। তখনই আমি দ্বিতীয়বার হাসলাম। আমার সঙ্গী দেবদূতকে দেখে এবং ঈশ্বর আর-একটি সত্য আমার কাছে প্রকাশ করেছেন জেনে আমার ভারি আনন্দ হল।

"কিন্তু তখনও আমার সব জানা হয়নি ! আমি তখনও জানি নি, মানুষ কী নিয়ে বাঁচে। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম, কবে ঈশ্বর বাকি সত্যটা আমার কাছে প্রকাশ করবেন। ষষ্ঠ বছরে দুটি যমজ মেয়ে নিয়ে স্ত্রীলোকটি এল। আমি তাদের চিনতে পারলাম ; তারা কী করে বেঁচে আছে তাও শুনলাম। সব শুনে ভাবলাম : 'মেয়েদের জন্য মা আমার কাছে জীবন ভিক্ষা চেয়েছিল, মায়ের কথা আমি বিশ্বাস করেছিলাম—ভেবেছিলাম বাবা-মা ছাড়া শিশুসন্তান বাঁচতে পারে না, অথচ একজন অপরিচিতা তাদের বড় করে তুলেছে !' অন্যের মেয়ের প্রতি স্নেহে স্ত্রীলোকটি যখন কাঁদল, তখন তার মধ্যে আমি জীবন্ত সৃষ্টিকর্তাকে দেখতে পেলাম,

আমি জানলাম মানুষ কী নিয়ে বাঁচে। তখন আমি বুঝলাম, ঈশ্বর আমার কাছে তৃতীয় সত্য প্রকাশ করেছেন, আমাকে ক্ষমা করেছেন। তাই আমি তৃতীয়বার হাসলাম।"

দশ

দেখতে দেখতে দেবদূতের দেহ নেমে এল। এমন তীব্র আলো দিয়ে সে দেহ গড়া যে সেদিকে তাকানো যায় না। অতি উচ্চকণ্ঠে সে কথা বলতে লাগল। মনে হল, কথাগুলো তার ভিতর থেকে আসছে না, স্বর্গ থেকে আসছে। দেবদূত বলল : "আমি জানলাম, মানুষ নিজের কৌশলে বাঁচে না, বাঁচে প্রেমে।"

"মানুষ হিসাবে আমি বেঁচে রইলাম—আমার চেষ্টায় নয়, বেঁচে রইলাম যেহেতু একজন পথের লোক ও তার স্ত্রীর হৃদয়ে প্রেম ছিল, তারা আমাকে দয়া করেছিল, ভালোবেসেছিল। বাপ-মা-হারা মেয়েদুটি বেঁচে রইল কোনো স্বার্থচিন্তার দ্বারা নয়, বেঁচে রইল, যেহেতু অপরিচিতার হৃদয়ে প্রেম ছিল, সে তাদের দয়া করেছিল, ভালোবেসেছিল। সব মানুষই বেঁচে থাকে—নিজেদের পরিকল্পনা অনুসারে নয়, মানুষের হৃদয়ের প্রেমের শক্তিতে।

"আগে জানতাম ঈশ্বর মানুষকে জীবন দান করেন, তিনি চান তারা বেঁচে থাকুক ; এখন আমি আরও কিছু জানলাম।

"আমি বুঝতে পারলাম, যদিও মানুষ মনে করে যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রচেষ্টাতেই সে বাঁচে, সে কিন্তু বাঁচে একমাত্র প্রেমে। যে মানুষ প্রেমময়, ঈশ্বর তার সঙ্গী, তার মধ্যে তিনি আছেন ; কারণ তিনিই প্রেম।"

দেবদূত ঈশ্বরের জয়গান করতে লাগল, তার কণ্ঠস্বরে কেঁপে-কেঁপে উঠল ঘরখানি। ঘরের ছাদ দুইভাগ হয়ে পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত একটা অগ্নিস্তম্ভ উঠে গেল। সাইমন, তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা পড়ে গেল মেঝেয়। দেবদূতের পিঠে পাখা গজাল, সে উড়ে গেল আকাশে।

সাইমনের যখন জ্ঞান ফিরে এল, তখন তার কুঁড়েঘর যেমন ছিল তেমনি আছে, আর তার নিজের পরিবার ছাড়া আর কেউ সেখানে নেই।

মুরগির ডিমের মতো বড় শস্যকণা

একবার কিছু ছেলেমেয়ে পাহাড়ের খাদে একটা জিনিশ পেল ; দেখতে শস্যকণার মতো, মাঝ–বরাবর খাঁজ–কাটা ; কিন্তু আকারে ঠিক একটা মুরগির ডিমের মতো বড়। সেই পথে যেতে–যেতে জনৈক পথিক সেটা দেখতে পেয়ে ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে এক পেনি দিয়ে কিনে শহরে গিয়ে দুর্লভ বস্তু হিসাবে রাজার কাছে বিক্রি করল।

রাজা জ্ঞানীজনদের ডেকে জানতে চাইলেন জিনিশটা কী। তারা অনেক ভাবনা–চিন্তা করেও মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না। একদিন জিনিশটা যখন জানালার তাকে পড়ে–থাকা অবস্থায় একটা মুরগি উড়ে এসে সেটাকে ঠুকরে তার ভেতর একটা গর্ত করে ফেলল, তখনই সকলে বুঝতে পারল যে সেটা একটা শস্যকণা। বিজ্ঞজনেরা রাজাকে গিয়ে বলল :

"এটা একটা শস্যকণা।"

শুনে রাজা খুব বিস্মিত হলেন; হুকুম জারি করলেন : এরকম শস্য কবে কোথায় উৎপন্ন হয়েছিল সেটা খুঁজে বের করতে হবে।

বিজ্ঞজনেরা আবার ভাবতে বসল, পুঁথির পাতা ওল্টাল, কিন্তু কোনো হদিশ পেল না। অতএব রাজার কাছে ফিরে গিয়ে তারা জানাল :

"আমরা কোনো জবাব দিতে পারলাম না। পুঁথিপত্রে এর কোনো উল্লেখ নেই। আপনি চাষীদের জিজ্ঞেস করুন এরকম বড় আকারের শস্য কবে ও কোথায় জন্মাত। হয়তো এ–খবর তাদের কেউ কেউ পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শুনে থাকতে পারে।"

তখন রাজা হুকুম দিলেন, খুব বুড়ো একজন চাষীকে তার কাছে ধরে আনতে হবে। চাকরেরাও সেরকম একজনকে পেয়ে তাকে রাজার কাছে এনে হাজির করল। লোকটি বুড়ো ও কুঁজো, গায়ের রং ছাইয়ের মতো, একটাও দাঁত নেই ; কোনোমতে দুটো লাঠিতে ভর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাজার কাছে উপস্থিত হল।

রাজা তাকে শস্যটা দেখালেন, কিন্তু বুড়োলোকটি কিছু দেখতেই পায় না ; জিনিশটা নিয়ে তাতে হাত বুলোতে লাগল। রাজা জিজ্ঞেস করলেন :

"তুমি কি বলতে পারো বুড়ো, এ–ধরনের শস্য কোথায় জন্মাত? এরকম শস্য কি কখনও কিনেছ, বা তোমার ক্ষেতে বুনেছ?"

বুড়োলোকটি এত কালা যে রাজার কথা তার কানেই গেল না ; অনেক কষ্টে কিছুটা বুঝে

নিয়ে বলল, "না! আমার ক্ষেতে এরকম শস্য কখনও বুনিওনি, কাটিওনি, বা কখনও কিনিওনি। আমরা যখন শস্য কিনতাম তখন সেগুলি এখনকার মতোই ছোট ছিল। আপনি বরং আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। এরকম শস্য কোথায় জন্মাত সেটা তিনি হয়তো শুনে থাকবেন।"

রাজা তখন বুড়োলোকটির বাবাকে আনতে লোক পাঠালেন, আর তারাও তাকে এনে রাজার কাছে হাজির করল। সে কিন্তু একটা লাঠিতে ভর দিয়ে হেঁটেই এল। রাজা তাকে শস্যকণাটা দেখালেন। বুড়ো চাষীটি এখনও চোখে দেখতে পায়। সেটাকে হাতে নিয়ে সে ভালো করে দেখতে লাগল। রাজা জিজ্ঞেস করলেন :

"তুমি কি বলতে পারো বুড়ো এরকম শস্য কোথায় জন্মাত? এরকমটা কি কখনও কিনেছ, বা তোমার ক্ষেতে বুনেছ?'

এই বুড়োটি কানে কম শুনলেও তার ছেলের চাইতে ভালো শুনতে পেত।

সে বলল, "না। আমার ক্ষেতে এরকম শস্য কখনও বুনিনি বা কাটিওনি। আর কেনার কথা যদি বলেন, আমাদের আমলে টাকারই চলন ছিল না, কাজেই আমি কখনও কিছু কিনিনি। প্রত্যেকেই যার-যার শস্য জন্মাত, এবং কারও কিছু প্রয়োজন হলে আমরা নিজেরাই ভাগাভাগি করে নিতাম। এ-ধরনের শস্য কোথায় জন্মাত আমি জানি না। আজকালকার গমের চাইতে আমাদের গম আকারে বড় ছিল এবং তা থেকে ময়দাও বেশি পাওয়া যেত, কিন্তু এতবড় শস্য আমি কখনও দেখিনি। অবশ্য বাবার কাছে শুনেছি, তার আমলে শস্য অনেক বড় হত এবং আমাদের কালের চাইতে বেশি ময়দা তা থেকে পাওয়া যেত। আপনি বরং তাকে জিজ্ঞেস করুন।"

কাজেই রাজা এই বুড়োর বাবাকে আনবার জন্য লোক পাঠালেন, আর তারাও তাকে পেয়ে রাজার কাছে হাজির করল। সে লাঠি ছাড়াই সহজভাবে হেঁটে এল; তার চোখ পরিষ্কার, কান ভালো, কথাও স্পষ্ট। রাজা তাকে শস্যকণাটা দেখালেন। বুড়ো ঠাকুর্দা সেটাকে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।

বলল, "কতদিন পরে এত ভালো একটা শস্যকণা দেখতে পেলাম।" বলে শস্যটার এক টুকরো দাঁতে কেটে নিয়ে সেটা খেতে লাগল।

"ঠিক সেই স্বাদ," সে আরও বলল।

রাজা বললেন, "বলো তো ঠাকুর্দা, কবে ও কোথায় এরকম শস্য জন্মাত? তুমি কি এরকম শস্য কখনও কিনেছ, বা তোমার ক্ষেতে বুনেছ?"

বুড়োলোকটি জবাব দিল :

"আমার আমলে এরকম শস্য সব জায়গায়ই জন্মাত। যৌবনকালে আমরা তো এইরকম শস্যই খেতাম, অপরকেও খাওয়াতাম। আর এইরকম শস্যই তো আমরা বুনতাম, কাটতাম, ঝাড়াই করতাম।"

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "বলো তো ঠাকুর্দা, সে-শস্য কি তোমরা কিনতে, না সবটাই নিজেরা ফলাতে?"

বুড়োলোকটি হাসল। জবাবে বলল, "আমার কালে রুটি কেনাবেচার মতো পাপের কথা কেউ ভাবতেই পারত না ; তাছাড়া টাকা কাকে বলে তাও আমরা জানতাম না। প্রত্যেকেই যথেষ্ট ফসল ফলাত।"

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে বলো তো ঠাকুর্দা, তোমাদের জমি কোথায় ছিল—

কোথায় তোমরা এ–ধরনের ফসল ফলাতে?"

ঠাকুর্দা জবাব দিল, "আমার জমি ছিল ঈশ্বরের পৃথিবীতে। যেখানেই লাঙল চালাতাম, সেখানেই আমার জমি। শুধুমাত্র পরিশ্রমেরই ছিল ব্যক্তিগত মালিকানা।"

রাজা বললেন, "আমার আরও দুটো প্রশ্নের জবাব দাও। প্রথম প্রশ্ন, তখন মাটিতে এত বড় ফসল ফলত, কিন্তু এখন আর ফলে না কেন? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন, তোমার নাতি হাঁটে দুটো লাঠিতে ভর দিয়ে, তোমার ছেলের লাগে একটা লাঠি, আর তোমার একটাও লাগে না—এটা কীরকম ব্যাপার? তোমার দৃষ্টি পরিষ্কার, দাঁত ভালো, কথা স্পষ্ট ও শ্রুতিমধুর। এটা কেমন করে হল?"

বুড়োলোকটি জবাব দিল :

"এরকমটা ঘটার কারণ মানুষ নিজের পরিশ্রমে জীবিকা অর্জন না–করে অপরের পরিশ্রমের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সেকালে মানুষ চলত ঈশ্বরের নিয়মে। যা নিজের তাই নিয়েই তারা সন্তুষ্ট ছিল, অন্যের ফসলের উপর কখনও লোভ করত না।"

এক টুকরো রুটি

একদিন ভোরবেলা এক গরিব চাষী লাঙল নিয়ে মাঠে এসেছে জমি চাষ করতে। তার সঙ্গে আছে এক টুকরো রুটি, খিদে পেলে নাশতা করবে। গায়ের জামা খুলে তা দিয়ে রুটিখানা জড়িয়ে সে রেখে দিল এক ঝোপের আড়ালে। তারপর লাঙল চালাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর লাঙল টেনে ঘোড়াটা ক্লান্ত হয়ে উঠল, চাষীরও বেশ খিদে পেল। তখন চাষী ঘোড়াটা ছেড়ে নাশতা করবে বলে ঝোপের কাছে এল। কিন্তু জামাটা খুলেই সে অবাক ! দেখে রুটির টুকরোটি সেখানে নেই। সে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল, জামা তুলে ঝাড়ল কিন্তু রুটিখানা সত্যিই নেই। অবাক চাষী ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারল না।

সে মনে মনে ভাবল, তাজ্জব ব্যাপার তো ! কাউকে কোথাও দেখতে পেলাম না অথচ রুটিটা নেই ! নিশ্চয়ই কেউ চুপিচুপি এসে ওটা নিয়ে পালিয়েছে।

আসলে চাষী যখন কাজে ব্যস্ত ছিল তখন এক শয়তান এসে এ–কাণ্ড করে গেছে। শয়তান তখনও ঝোপের আড়ালে বসে ছিল। রুটি হারিয়ে চাষী কীভাবে গালাগালি করে তাই সে শুনবে। শুনে আমোদ পাবে।

রুটির টুকরোটি হারিয়ে চাষীর মনে খুব দুঃখ হল বটে কিন্তু সে মনে মনে বলল : যাকগে, কী আর করা যাবে। আমি তাই বলে খিদেয় মরে যাব না। যার দরকার ছিল নিশ্চয়ই এমনি কোনো লোক ওটা নিয়েছে। যেই নিয়ে থাক যেন লোকটার উপকার হয়।

এই বলে উঠে সে কূপের কাছে গেল। সেখান থেকে পানি খেয়ে বিশ্রাম করল কিছুক্ষণ। বিশ্রামের পরে আবার লাঙল জুতে জমি চাষ করতে লাগল।

এই দেখে শয়তানের কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেল। মন খারাপ হবারই কথা। সে ভেবেছিল, রুটির টুকরোটি না–পেয়ে চাষী ভয়ানক রেগে যাবে। রেগে গিয়ে গালাগালি শুরু করবে যা–তা বলে। কিন্তু চাষীকে দিয়ে সেরকম কোনো অন্যায় কাজই সে করাতে পারল না। শয়তান অবশেষে তাদের সরদারের কাছে গিয়ে সব খুলে বলল।

সরদার তার কথা শুনে ভয়ানক রেগে উঠল, তুমি চাষীকে রাগাতে পারলে না তো কী করে এলে ? তুমি দেখছি নিজের কাজই বুঝতে পারো না ! চাষী আর তাদের বউ–ঝিরা যদি এমন ভালোমানুষ হয়ে ওঠে তাহলে শয়তানদের ঠাঁই হবে কোথায় ? কাদের নিয়ে আমাদের কাজ–কারবার চলবে ? এরকম করলে তো চলবে না। শিগ্‌গির আবার ফিরে যাও। গিয়ে

ঠিকমতো কাজ করে এসো। যদি তিনবছর সময়ের মধ্যে তুমি এ–চাষীকে বিপথে না–আনতে পারো তবে তোমাকে আর দলে রাখব না, হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি।

সরদারের কথায় শয়তান ভয় পেয়ে গেল। তক্ষুনি সে আবার নেমে এল পৃথিবীতে। এসে ভাবতে লাগল, কী উপায় সে করবে। কী করে লোকটাকে দিয়ে খারাপ কাজ করাবে। ভাবতে ভাবতে একটা মতলব শয়তানের মাথায় এল। চমৎকার মতলব !

সে একজন মজুর সাজল। মজুর সেজে কাজ করতে গেল সেই গরিব চাষীর বাড়ি। প্রথম বছরে সে চাষীকে পরামর্শ দিল শুধু নিচু–জমিতে ফসল বুনতে। চাষী তার কথা শুনে নিচু জমিতে ফসল বুনল। ফলে কী হল ?

সে–বছর বৃষ্টি হল খুব কম। সবার ফসলই রোদে জ্বলেপুড়ে নষ্ট হয়ে গেল। এদিকে সেই গরিব চাষীর দ্বিগুণ ফসল ফলল সেবার। ফলে সারাবছর খেয়েও তার অনেক শস্য বেঁচে গেল। বাড়তি শস্য বিক্রি করে অনেক টাকা পেল সে।

পরের বছর চাষীকে শয়তান পরামর্শ দিল সবচেয়ে উঁচুজমিতে ফসল বুনতে। চাষী তাই করল। সেবার কিন্তু গ্রীষ্মের সময় বৃষ্টি হল খুব বেশি। সবার ক্ষেতের ফসলই বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গেল। আর চাষী উঁচুজমির ফসল আগের বছরের চেয়েও ভালো হল। এবার খেয়ে বেঁচে গেল আরও বেশি ফসল। এত বাড়তি ফসল দিয়ে চাষী কী করবে ভেবেই পেল না।

শয়তান তখন চাষীকে এক নতুন পথ বাতলে দিল। শস্য থেকে কী করে ভদ্‌কা মদ তৈরি করতে হয় তাই শিখিয়ে দিল তাকে।

চাষীর তখন মহানন্দ। ভদ্‌কা তৈরি করে সে নিজে তো খেতে লাগলই—বন্ধুদেরও ডেকে খাওয়াতে লাগল।

শয়তান তখন মনের আনন্দে তার সরদারকে গিয়ে বলল, এতদিনে আমার মনের বাসনা পূরণ করে এসেছি। সেবার ঠকেছিলাম, এবার আর ঠকাতে পারেনি।

সরদার সহজ পাত্র নয়। সে বলল, দাঁড়াও, একবার আমার নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখে আসতে দাও।

এই বলে সরদার নেমে এল চাষীর বাড়ি। এসে দেখল, চাষী তার সব ধনী–বন্ধুদের দাওয়াত করে এনেছে। বাড়িতে এনে ভদ্‌কা খেতে দিয়েছে। চাষীর বউ মেহমানদের ভদ্‌কা বিলিয়ে দিচ্ছে। ভদ্‌কার পাত্র নিয়ে একটি টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে–যেতে ধাক্কা লেগে তার খানিকটা মেঝেয় পড়ে গেল হঠাৎ। তাই দেখে চাষী রেগে বলে ওঠল, ও কী করেছ বোকা মেয়েমানুষ কোথাকার ! একি তোমার ময়লা পানি পেয়েছ যে ইচ্ছেমতো খানিকটা মেঝেতে ঢেলে দেবে ? যতসব বে–আক্কেলে মেয়েমানুষ।

শয়তান তখন সরদারকে ইশারায় ব্যাপারটা দেখিয়ে বলল, এবার দেখ, এ লোকই একদিন একমাত্র সম্বল তার রুটির টুকরোটি হারিয়ে একটুও অস্থির হয়নি। আর আজ ?

চাষী কিন্তু তখনও এই নিয়ে বউয়ের সঙ্গে রাগারাগি করেই চলেছে। বউয়ের হাত থেকে পাত্রটি ছিনিয়ে নিয়ে সে নিজেই তখন মদ বিলাতে শুরু করেছে। এমন সময় সেখানে এসে ঢুকল সে–গাঁয়েরই এক গরিব লোক। তাকে দাওয়াত করা হয় নি। মাঠে কাজ করে লোকটা বাড়ি ফিরছিল। যেতে–যেতে এখানে এসে ঢুকেছে। ঘরে ঢুকেই সবাইকে অভিবাদন করে সে একপাশে বসে মদ খাওয়া দেখতে লাগল। সারাদিন কাজ করে লোকটা খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তৃষ্ণাও পেয়েছে বেশ। সে ভাবছিল, এ–সময় একফোঁটা মদ পেলে বেশ হত। চেয়ে চেয়ে দেখে তৃষ্ণাটা তার বেড়েই চলেছে। কিন্তু চাষী তার দিকে একফোঁটা মদও দিতে রাজি

নয়। সে বরং বলে উঠল, যাকে-তাকে ভদ্‌কা বিলানো আমার কাজ নয়।

চাষীর মুখে এ-কথা শুনে শয়তানের সরদার খুব খুশি। কিন্তু শয়তান নিজে খুশি হয়েছে আরও বেশি। তাই হাসতে হাসতে সে সরদারকে বলল, চুপ করো একটু, আরও মজা দেখতে পাবে এক্ষুনি।

মেহমানরা সবাই ভদ্‌কা খেয়েছে। বাড়িঅলা চাষীও খেয়েছে মনের সুখে। ভদ্‌কা খেয়ে যত রাজ্যের সত্যিমিথ্যে আবোলতাবোল গল্প শুরু করেছে সবাই মিলে।

শয়তানের সরদার সব শুনছে আর মনে-মনে শয়তানের বুদ্ধির প্রশংসা করছে। সে বলছে, একটু মদ খেয়েই যদি লোকগুলো শিয়ালের মতো একে অপরকে ঠকাতে চেষ্টা করে তাহলে আমাদের মুঠোর ভেতর এসে পড়তে আর বাকি কী?

শয়তান বলল, আরেকটু থামো। দেখে নাও এরপর কী মজা শুরু হয়। আরেক গ্লাস করে সবাইকে খেতে দাও। তখন দেখবে মজা। এখন ওরা শিয়ালের মতো লেজ নাড়ছে আর একে অপরকে খুশি করতে চাইছে। এরপর দেখবে, এরাই হয়েছে সব এক-একটা ভয়ানক নেকড়ে বাঘ!

আরও এক গ্লাস করে সবাই যখন খেল তখন তাদের মুখে তুবড়ি ছুটছে। গল্প-গুজবের পরিবর্তে এবার আরম্ভ হয়েছে চিৎকার। রাগের মাথায় একজন আরেকজনকে যা-খুশি বলছে। একটু পরেই শুরু হল হাতাহাতি আর মারামারি। একজনের নাকের উপর আরেক জনের ঘুষি। বাড়িঅলাও এসে যোগ দিল মেহমানদের সঙ্গে। সে মারও খেল আচ্ছারকম।

শয়তানের সরদার অতি-আনন্দে তামাশা দেখতে লাগল। আর মনে-মনে বলে উঠল, চমৎকার তো!

কিন্তু তখনও শয়তান বলছে, আরেকটু সবুর করো। আরেক গ্লাস পেটে পড়তে দাও, তারপর দেখবে মজা। এখন ওরা লড়াই করছে নেকড়ের মতো। এরপর করবে শূকরের মতো।

তৃতীয় গ্লাস খেয়ে সত্যিই লোকগুলো জানোয়ারের মতো ব্যবহার করতে লাগল। অদ্ভুত ধরনের চিৎকার শুরু করল তারা। অকারণে শুধুই চিৎকার করছে, কেউ কারোর কথায় কান দিচ্ছে না।

এরকমভাবে কিছুক্ষণ কাটিয়ে তারা বাড়ি ফিরতে লাগল। কেউ একাই টলতে-টলতে হেলেদুলে চলতে লাগল, অনেকে দুজন বা তিনজনের দল বেঁধে। বাড়িওলা চাষী দরজা অবধি এসেছিল তাদের বিদায় দিতে। সেখানে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল কাদায়। মাথা থেকে পা অবধি সারা গা তার লেপটে গেল কাদার ভেতর। মুখ গুঁজে পড়ে সে ঠিক শূকরের মতো ঘোঁত্ ঘোঁত্ করত লাগল।

তাই দেখে শয়তানের সরদার আরও খুশি। সে শয়তানকে বলল, ভারি মজার জিনিস তৈরি করেছ তুমি। রুটির ব্যাপারে যে-ভুলটুকু করেছিলে, ভদ্‌কা তৈরি করে সে-ভুল শুধরে গেল তোমার। কিন্তু এখন বলো তো, কী করে এই আজব জিনিসটা তুমি তৈরি করেছ? প্রথমে বুঝি দিয়েছ শিয়ালের রক্ত, তাই শিয়ালের মতো করছিল লোকগুলো। তারপর বুঝি দিয়েছ নেকড়েবাঘের খানিকটা রক্ত, তাতেই নেকড়ের স্বভাব পেয়েছিল ওরা। আর সবশেষে দিয়েছ শূকরের রক্ত, তাই ঘোঁত্ ঘোঁত্ করছিল ওরা ঠিক শূকরের মতোই।

শয়তান মাথা নেড়ে বলল, না, সেসব কিছুই না। প্রথমে আমি শুধু বুঝতে পেরেছিলাম, চাষী তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল পেয়েছে। জানোয়ারের রক্ত মানুষের মধ্যে আগে

থেকেই ছিল। যতক্ষণ অবধি সে শুধু প্রয়োজনীয় ফসল পেয়েছে ততক্ষণ সেই জানোয়ারের স্বভাব চাপা পড়েছিল। সে–সময় চাষী তার শেষ সম্বল একটুকরো রুটি হারিয়েও কোনও অনাসৃষ্টি কাণ্ড বাধায়নি। কিন্তু যখন থেকে তার ফসল খেয়েদেয়ে বাড়তি হতে লাগল তখনই সেই বাড়তি ফসল দিয়ে সে আমোদ করার উপায় খুঁজতে লাগল। আমি তখনই তাকে সেই আমোদের পথ দেখিয়ে দিলাম, মদ পানের আনন্দ। তারপর যখন থেকে সে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান এই ফসলকে মদে পরিণত করে তাই পান করতে লাগল তখন থেকেই তার ভেতরকার শিয়াল, নেকড়ে ও শূকর মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সে যদি শুধু ভদ্‌কা খেতে শুরু করে তবে বন্যপশুই হয়ে উঠবে দুচার দিন পরে।

শয়তানের কথা শুনে এবার কিন্তু সরদারের মন খুশিতে ভরে উঠল। মনের খুশিতে শয়তানের বুদ্ধির তারিফ করতে করতে সে চলে গেল।

মানুষের ভালোবাসা

এক শহরে এক মুচি বাস করত। নাম তার মার্টিন এবডিশ। একতলার যে-ছোট্ট ঘরটিতে সে থাকত তার একটিমাত্র জানালা। জানালাটি রাস্তার দিকে। কাজেই তার ভিতর দিয়ে রাস্তার লোকজন দেখা যেত। অবশ্য দেখা যেত শুধু তাদের পা, আর মার্টিন এবডিশও জুতো দেখেই লোক চিনতে পারত। অনেকদিন ধরে সে এখানে আছে, কাজেই অনেকের সঙ্গেই তার জানাশোনা। দু-একবার তার হাতে এসে পড়েনি এমন একজোড়া জুতো এ তল্লাটে খুঁজে পাওয়া ভার। কাজও পেত সে প্রচুর, কারণ সে কাজ করত সৎপথে, ভালো জিনিশ দিত, দাম নিত অল্প, আর সবসময় কথা ঠিক রাখত। ঠিক সময়মতো যে-কাজ করে দিতে পারবে শুধু সেই কাজই সে নিত ; অকারণে কাউকে ভোগাত না। এবডিশকে সকলেই চিনত, তাই সে-কাজও পেত প্রচুর।

এমনিতেই সে মানুষ ভালো। তার উপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবতে শুরু করল জীবনের কথা, তাই ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়ল ধর্মের দিকে। কাজ শেখার সময়েই তার স্ত্রী মারা যায় একটিমাত্র তিনবছরের ছেলে রেখে। তাদের অন্য সব সন্তান আগেই মারা গিয়েছিল। প্রথমে মার্টিন ভেবেছিল, ছোটছেলেটিকে তার বোনের কাছে গ্রামে পাঠিয়ে দেবে ; কিন্তু পরে সে ভাবল : 'কোনো অপরিচিত পরিবারে মানুষ হতে হলে আমার ছোট্ট ক্যাপিটোশকের কষ্ট হবে। তার চেয়ে সে আমার কাছেই থাকুক।' কাজেই কাজ শেখা শেষ করে এবডিশ ছোটছেলেকে নিয়ে একটা বাসাবাড়িতে গিয়ে উঠল। ছেলেটি বড় হয়ে সবে বাপকে কিছু কিছু সাহায্য করে তাকে সুখী করতে শুরু করেছে, এমন সময় সে অসুখে পড়ল, বিছানা নিল, আর একসপ্তাহ জ্বরে ভুগে মারা গেল।

মার্টিন ছেলেটিকে হারিয়ে গভীর হতাশায় ভেঙে পড়ল একেবারে। এমনকি ধর্মে পর্যন্ত বিশ্বাস হারাতে বসল। গভীর নৈরাশ্যে বারবার ঈশ্বরের কাছে মৃত্যুভিক্ষা করল। এমনকি তার মতো একটা বুড়ো-হাবড়ার পরিবর্তে তার একমাত্র প্রিয় পুত্রকে কাছে টেনে নেবার জন্য ঈশ্বরকে তিরস্কার পর্যন্ত করল। শেষটায় সে প্রার্থনা করাই ছেড়ে দিল।

একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে এল একজন বুড়ো তীর্থযাত্রী—সাত বছর ধরে সে তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কথায় কথায় এবডিশ তাকে জানাল তার নিজের দুঃখের কথা। সে বলল, "আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না বাবাজি, শুধু মরতে চাই। ঈশ্বরের কাছে এ ছাড়া

আর কিছুই আমার চাওয়ার নেই। আজ আমার কেউ নেই, কোনো আশাও নেই।"

বুড়ো তীর্থযাত্রী জবাব দিল, "না না, এমন কথা বোলো না এবডিশ। ঈশ্বরের কাজের বিচারক আমরা নই। ঈশ্বরের বিচারের উপরেই আমাদের নির্ভর করতে হবে, আমাদের বুদ্ধির উপরে নয়। তিনি যখন ভেবেছেন যে তোমার ছেলেকে মরতে হবে আর তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে, তখন সেটাকেই ঠিক বলে মেনে নেয়া উচিত। তুমি-যে এত দুঃখ পাচ্ছ তার কারণ শুধুমাত্র নিজের সুখের জন্যই তুমি বাঁচতে চেয়েছ।"

"তাহলে আর কিসের জন্য লোক বেঁচে থাকে?" এবডিশ প্রশ্ন করল।

"শুধুমাত্র ঈশ্বরের জন্য।" বুড়োলোকটি জবাব দিল। "এ জীবন তারই দান, কাজেই তাঁর জন্যই তোমার বেঁচে থাকা উচিত। যখন তাঁর জন্য বেঁচে থাকতে শুরু করবে, দেখবে তখন আর তোমার ক্ষোভ থাকবে না, সবকিছুই তোমার কাছে বেশ সহজ হয়ে আসবে।"

এবডিশ চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পর বলল, "কিন্তু ঈশ্বরের জন্য আমি কেমন করে বাঁচব?"

বুড়োলোকটি বলল, "সে-পথ তো ঈশ্বরই আমাদের দেখিয়েছেন। তুমি পড়তে পার তো? একখানা 'পবিত্র ধর্মগ্রন্থ' কিনে পড়ো, তাহলেই বুঝতে পারবে কেমন করে ঈশ্বরের জন্য বাঁচতে হয়। হ্যাঁ, সে বইতে সব লেখা আছে।"

কথাগুলো এবডিশের অন্তরে গভীর রেখাপাত করল। সেইদিনই বেরিয়ে সে বড় হরফে ছাপা একখানি 'পবিত্র ধর্মগ্রন্থ' কিনে পড়তে আরম্ভ করল।

এবডিশ প্রথমে ভেবেছিল শুধু ছুটির দিনগুলোতে বইখানা পড়বে। কিন্তু একবার পড়তে আরম্ভ করে মনে এমন শান্তি পেল যে রোজই পড়তে লাগল। একদিন তো পড়ায় এমন ডুবে গেল যে বাতির সবটা কেরোসিন পুড়ে শেষ না-হওয়া পর্যন্ত সে বই ছেড়ে উঠতেই পারল না। যতই পড়ে ততই যেন সে স্পষ্ট করে বুঝতে পারে ঈশ্বর তার কাছে কী চায়, কেমন করে ঈশ্বরের জন্য বাঁচা যায়; ততই তার অন্তর হালকা হতে থাকে। আগে যখনই সে ঘুমের জন্য শুত তখনই তার ছোট্ট ক্যাপিটোশকার কথা মনে করে যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করে উঠত। কিন্তু এখন সে বারবার বলে, "হে ঈশ্বর। তোমার জয় হোক! তোমার জয় হোক! তোমারই ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!"

সেইদিন থেকে এবডিশের জীবন সম্পূর্ণ বদলে গেল। আগে সে ছুটির দিনগুলোতে সরাইখানায় গিয়ে একটু চা খেত, কখনোবা এক গ্লাস ভদ্‌কাও খেত। বন্ধুর সঙ্গে অল্পকিছু পান করে যখন সে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে আসত, তখন ঠিক মাতাল না হলেও, তার পা টলত এবং আজেবাজে বকত; কখনোবা বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া-চেঁচামেচিও করত। কিন্তু এখন এসব সে ছেড়ে দিয়েছে; তার জীবনে ফিরে এসেছে সুখ ও শান্তি। সে কাজে বসত খুব ভোরে উঠে; যতক্ষণ কাজ করার একটানা খাটত; তারপর তাকের উপর থেকে বাতিটা নামিয়ে পড়তে বসত। যত পড়ে তত সব বোঝে; যত বোঝে তত তার মন পরিষ্কার হয়, আনন্দে ভরে ওঠে।

একদিন পড়তে পড়তে অনেক রাত হয়ে গেল। সে পড়ছিল:

"যদি কেউ তোমার এক গালে চড় মারে, তাহলে অপর গাল তার দিকে এগিয়ে দাও; কেউ যদি তোমার ক্লোকটা নেয়, তাকে তোমার কোটটাও দিয়ে দাও। তোমার কাছে কেউ কিছু চাইলে সেটা তাকে দাও, কখনও ফেরত চেয়ো না। মানুষের কাছে যেমন ব্যবহার তুমি আশা করো, ঠিক তেমনি ব্যবহার তাদের সঙ্গে করো।"

আরও এগিয়ে সে পড়তে লাগল যেখানে ঈশ্বর বলছেন :

"তোমরা আমাকে মুখে বলবে ঈশ্বর-ঈশ্বর, অথচ আমি যা বলি তা করবে না, এ কেমন কথা? যে-লোক আমার কাছে আসে, আমার আদেশ শোনে, সেগুলো পালন করে, সে কেমন লোক বলছি : সে হচ্ছে সেই মানুষ যে বাড়ি তৈরি করে গভীর করে খুঁড়ে পাথরের ওপর তার ভিত্তি স্থাপন করে। ফলে বন্যা এলে, নদী আছড়ে পড়লে সেই বাড়িকে একটুও নড়াতে পারে না, কারণ সে বাড়ি-যে পাথরের উপর গড়া! কিন্তু যে-লোক আমার কথা শোনে, অথচ তা পালন করে না সে হচ্ছে সেই মানুষ যে বিনা ভিতে মাটির উপর বাড়ি তৈরি করে; তারপর নদী যখন আছড়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যায় বাড়িটা।"

এই কথাগুলো পড়ে এবডিশের মন খুশিতে ভরে উঠল। সে চশমাটা খুলে টেবিলের উপর কনুই রেখে ভাবতে লাগল। ওই কথাগুলো দিয়ে নিজের জীবনের পরিমাপ করতে বসে সে নিজের মনেই ভাবতে লাগল :

"আমার বাড়ি কিসের উপর স্থাপিত—পাথরের উপর, না বালির উপর? যদি পাথরের উপর হয়, তাহলে ভালো। কিন্তু আমি তো অনায়াসেই ভাবতে পারি যে ঈশ্বরের সব নির্দেশ মেনে চলেও হয়তো অসতর্কতার দরুন পাপ করে বসলাম। যাই হোক, আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না। হে ঈশ্বর! তুমি আমার সহায় হও।"

এইরকম ভাবতে ভাবতে তার ঘুমোবার সময় হল, তবু বই ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করল না। পরের অংশগুলোও পড়তে শুরু করল। যেখানে একজন ধনী ফ্যারিসির প্রসঙ্গ তুলে অতিথিপরায়ণতার কথা বলা হয়েছে।

পড়া শেষ হলে সে চশমা খুলে বইয়ের উপরে রেখে নিজেকে বলতে লাগল : "এই ফ্যারিসিটি ঠিক আমার মতো। আমার মতোই সে শুধু নিজের কথাই ভেবেছে। অতিথির কথা চিন্তা না করে সে গরমে বসে আরাম করে চা খেয়েছে। সে নিজের যত্ন নিজে নিয়েছে, অতিথিকে যত্ন করেনি। আর, সে অতিথি কে? স্বয়ং প্রভু! তিনি যদি আমার কাছে আসেন, আমিও কি অমন করব?"

দুই হাতের মধ্যে মাথা রেখে কখন-যে এবডিশ ঘুমিয়ে পড়েছে সে নিজেই টের পায়নি।

"এবডিশ!"—অকস্মাৎ একটি কণ্ঠস্বর যেন নিশ্বাসের মতো তার কানে এসে বাজল।

তন্দ্রার মধ্যেই জেগে উঠল এবডিশ।

কে ওখানে? মার্টিন চারদিকে চোখ ঘোরাল। তাকাল দরজার দিকে। কেউ নেই। আবার সে টেবিলের উপর ঝুঁকে বসল। সহসা সে আবার স্পষ্ট শুনতে পেল :

"মার্টিন! মার্টিন! কাল রাস্তার দিকে চেয়ে থেকো। আমি তোমাকে দেখতে আসব।"

এবডিশের ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দাঁড়াল চেয়ার থেকে। চোখ মুছল। বুঝতে পারল না, কথাগুলো সে শুনেছে, না স্বপ্ন দেখেছে।

বাতি নিভিয়ে সে আবার শুয়ে পড়ল।

পরদিন ভোর হবার আগেই এবডিশ উঠে প্রার্থনা করল, স্টোভ ধরাল, কপির ঝোল আর 'কাশা' চড়াল, 'সামোভার' জ্বালাল, অ্যাপ্রন পরল, তারপর জানালার পাশে কাজে বসল। কাজ করতে করতেই গতরাত্রের ঘটনার কথা ভাবতে লাগল সে। তার মনে দুটো ভাব দেখা দিল। একবার মনে হল, সে স্বপ্ন দেখেছে; আবার পরমুহূর্তেই মনে হল, সত্যি সে-কণ্ঠস্বর সে শুনেছে। মনে মনে ভাবল, হ্যাঁ, এমন ঘটনা তো ঘটেই।

জানালার পাশে বসে মার্টিন যত-না কাজ করল তার চাইতে বেশি সময় তাকিয়ে রইল

বাইরের দিকে। যখনই কেউ অচেনা জুতো পরে আসে, অমনি সে মুখ নিচু করে তাকিয়ে তার মুখ এবং জুতো দুই-ই দেখতে চেষ্টা করে। নতুন ফেল্ট-বুট পরে এল একজন দারোয়ান। একজন বাঁকে করে জলের ভারী পাত্র নিয়ে চলে গেল। একসময় প্রথম নিকোলাসের সময়কার একজন বুড়ো সৈনিক, পায়ে পুরোনো তালিমারা জুতো, হাতে একটা শাবল নিয়ে একেবারে জানালার নিচে এসে দাঁড়াল। জুতো-জোড়া দেখেই এবডিশ তাকে চিনল। লোকটার নাম স্তেপানিচ, জনৈক প্রতিবেশী ব্যবসায়ীর বাড়িতে সে থাকে। তাঁর কাজ দারোয়ানকে সাহায্য করা। স্তেপানিচ এবডিশের জানালার বাইরের জমা বরফ সরাচ্ছিল। এবডিশও তার দিকে একবার তাকিয়ে নিজের কাজে মন দিল।

"আরে! বুড়ো বয়সে কি তোমার ভীমরতি হল?"—কথাটা ভাবতেই এবডিশ হেসে ফেলল। "স্তেপানিচ এসেছে বরফ পরিষ্কার করতে, আর আমি ভাবছি কি-না স্বয়ং প্রভু এসেছেন আমার কাছে। কী বুড়ো গাধাই-যে আমি হয়েছি!"

যাহোক, আবার সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। স্তেপানিচ তখন শাবলটাকে দেয়ালের গায়ে রেখে বিশ্রাম করছে আর নিজেকে একটু গরম করতে চেষ্টা করছে।

এবডিশ মনে মনে বলল, "লোকটা বুড়ো হয়েছে, শরীরও ভেঙে পড়েছে; বরফ পরিষ্কার করবার মতো জোরও নেই। ওকে একটু চা দিলে কেমন হয়? সামোভারে জল এতক্ষণে নিশ্চয় ফুটেছে।"

সামোভারটাকে টেবিলের উপর রেখে, চা তৈরি করল এবডিশ। জানালার পাল্লায় আঙুলের টোকা মেরে ডাকতেই স্তেপানিচ মুখ ঘুরিয়ে জানালার দিকে এগিয়ে এল।

"ভিতরে এসে একটু গরম হয়ে নাও," মার্টিন বলল, "তুমি যে একেবারে জমে গেছ!"

স্তেপানিচ বলল, "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! আমার হাড়গুলো অবধি কাঁপছে।"

ভিতরে ঢুকে সে গায়ের বরফ ঝেড়ে ফেলতে লাগল। ঘরের মেঝে পাছে নোংরা হয়ে যায় তাই খুব যত্ন করে পা মুছতে শুরু করল স্তেপানিচ।

"তোমাকে আর পা মুছতে হবে না। তোমার জুতো আমিই পরিষ্কার করে দেব। এখানে এসে বসো, একটু চা খাও।"

এবডিশ দু-গ্লাস চা তৈরি করে এগিয়ে দিল অতিথির দিকে, আর নিজেরটা থালায় ঢেলে নিয়ে ফুঁ দিতে লাগল।

স্তেপানিচ গ্লাসের সবটা চা খেয়ে তাকে ধন্যবাদ দিল। বেশ বোঝা গেল আর-এক কাপ চা পেলে সে বেশ তৃপ্তি পেত।

দুজনের জন্য আর-এক গ্লাস করে চা ঢেলে এবডিশ বলল, "আর-এক গ্লাস খাও।"

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে তাকাতে এবডিশ চা খেতে লাগল।

তার অতিথি জিজ্ঞেস করল, "কারও আসবার জন্য তুমি অপেক্ষা করছ নাকি?"

"অপেক্ষা? কার জন্য-যে অপেক্ষা করছি সেকথা বলতেও লজ্জা হচ্ছে। অপেক্ষা—মানে ঠিক অপেক্ষা করা নয়, অথচ কথাগুলোকে মন থেকে তাড়াতেও পারছি না। আমি নিজেই জানি না, সেটা স্বপ্ন না কী। দেখ ভাই, কাল রাত্রে আমি প্রভু যিশুর সুসমাচার পড়ছিলাম। এই পৃথিবীতে এসে কত-যে দুঃখ তিনি পেয়েছেন! সে-সব তো তুমিও শুনেছ, কি বলো?"

স্তেপানিচ জবাব দিল, "হ্যাঁ, শুনেছি। তবে আমরা তো মুখ্যু লোক, পড়তেও জানি না।"

"তারপর, শোনো, আমি পড়ছিলাম এই পৃথিবীতে তিনি কেমন ছিলেন, কেমন করে তিনি একদিন এক ফ্যারিসির বাড়ি গেলেন, অথচ সে-লোকটা তাঁর অভ্যর্থনার কোনো আয়োজন

করল না। জানো ভাই, কাল রাতে এইসব পড়ে সেই কথা ভাবছিলাম—ভাবছিলাম, ধরো, তিনি আমার কাছে বা আমারই মতোন আর কারও কাছে এলেন। জমিদার সাইমনের মতো আমরাও কি তাঁকে অভ্যর্থনা করতে ভুলে যাব? তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে যাব না? এইসব ভাবতে ভাবতে যেখানে বসেছিলাম সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লাম। সেই অবস্থায়ই শুনতে পেলাম, কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে। আমি উঠে পড়লাম। সেই কণ্ঠস্বর যেন আমার কানে চুপিচুপি বলল, 'কাল আমার জন্য অপেক্ষা কোরো, কারণ আমি তোমার কাছে আসব।' দুবার এ–কথাগুলি সে বলল। সেই থেকে কথাগুলো যেন আমার মনের মধ্যে গেঁথে আছে। আর, যতই বোকামি হোক তবু তাঁরই জন্য আমি অপেক্ষা করে আছি।"

স্তেপানিচ শুধু ঘাড় নাড়তে লাগল, মুখে কিছুই বলল না। গ্লাসের চা সবটা খেয়ে একপাশে নামিয়ে রাখল। এবডিশ গ্লাসটা নিয়ে ভরে দিল আবার।

বলল, "এটাও খেয়ে ফ্যালো। এতে তোমার উপকার হবে। হ্যাঁ, তারপর শোনো। আমি প্রায়ই ভাবি, আমাদের প্রভু যখন এই পৃথিবীতে ছিলেন, তিনি কাউকে ঘৃণা করতেন না, তা সে যত ছোটই হোক। তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গেই মিশতেন, তাদের সঙ্গেই থাকতেন, আর বিশেষ করে আমাদের মতো পাপী–তাপী শ্রমিকদের মধ্যে থেকেই তাঁর শিষ্যদের বেছে নিতেন। তিনি বলতেন, 'যে বড় আছে সে–ই ছোট হবে, আর যে ছোট আছে সে–ই বড় হবে।' তিনি আরও বলতেন, 'তোমরা আমাকে প্রভু বলে ডাকলেও আমি তোমাদের পা ধুইয়ে দেব। যে পথ দেখাতে চায় তাকে সকলের দাস হতে হয়। কারণ যারা দরিদ্র, যারা দীন, যারা কোমল, যারা দয়ালু, তারাই ধন্য।'

স্তেপানিচ চা খেতে একদম ভুলে গিয়েছিল। বুড়োমানুষ সে, সহজেই তার চোখে জল আসে। চুপ করে বসে শুনতে শুনতে তার দুই গাল বেয়ে জল গড়াতে লাগল।

এবডিশ বলল, "নাও, আরও একটু খাও।"

স্তেপানিচ তাকে ধন্যবাদ দিয়ে গ্লাস সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল।

বলল, "আমাকে নেমন্তন্ন করার জন্য ধন্যবাদ মার্টিন এবডিশ, তুমি আমার দেহ ও মন দুয়েরই খোরাক জুগিয়েছ।"

এবডিশ বলল, "তুমি আবার এসো। অতিথি–অভ্যাগত এলে আমার খুব ভালো লাগে।"

স্তেপানিচ চলে গেলে মার্টিন চায়ের সাজসরঞ্জাম সরিয়ে রেখে জানালার পাশে গিয়ে কাজে বসল। জুতো সেলাই করতে করতে কেবলই সে বাইরে তাকাচ্ছিল, আশা করছিল যিশুকে দেখতে পাবে।

এরপর এল একটি স্ত্রীলোক। পায়ে পশমি মোজা ও খুব পুরানো জুতো। এবডিশ জানালা দিয়ে দেখতে পেল, স্ত্রীলোকটি আগন্তুক ; তার পোশাক–পরিচ্ছদও খারাপ। একটি শিশুকে কোলে নিয়ে বাতাসের দিকে পিঠ রেখে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। শিশুটিকে ভালোভাবে ঢাকবার চেষ্টা করছিল সে, কিন্তু ঢাকবার মতো কিছুই তার নেই। তার পরনে ছিল গ্রীষ্মের কাপড়–জামা ; তাও ছেঁড়া। জানালার ওপাশ থেকেই এবডিশ শুনতে পেল শিশুটি কাঁদছে, আর স্ত্রীলোকটি তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করছে। এবডিশ এগিয়ে গিয়ে ডাকল, "এই–যে ভালোমানুষের মেয়ে!"

স্ত্রীলোকটি শুনতে পেয়ে ফিরে দাঁড়াল।

"শিশুটিকে নিয়ে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছ কেন? ভিতরে এসো। এখানে ওকে আরও ভালোভাবে গরমে ঢেকে রাখতে পারবে। চলে এসো।"

অ্যাপ্রন–পরা নাকে–চশমা–আঁটা একটি বুড়োমানুষ তাকে ডাকছে দেখে অবাক হলেও স্ত্রীলোকটি তার পিছনে পিছনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঘরে ঢুকল।

বুড়ো স্ত্রীলোকটিকে বিছানার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, "ভালোমানুষের মেয়ে, এখানে বসে পড়ো। নিজে গরম হও, আর বাচ্চাকে কিছু খাওয়াও।"

স্ত্রীলোকটি বলল, "আমার তো বুকে দুধ নেই। আর আমি নিজেও সকাল থেকে কিছু খাইনি।"

শিশুটিকে সে বুকে চেপে ধরল।

এবডিশ মাথা নাড়তে নাড়তে টেবিলের কাছে গিয়ে, রুটি ও একটা পাত্র আনল। তারপর উনুনের ঢাকনা খুলে কপির ঝোল ঢালল পাত্রে। 'কাশা' পাত্রটাও বের করল, কিন্তু সেটা তখনও তৈরি হয়নি। কাজেই শুধু ঝোলটাই টেবিলের উপর রাখল। টেবিলের উপর একটা চাদর বিছিয়ে দিয়ে রুটি নিয়ে এল।

"ভালোমানুষের মেয়ে, এখানে বসে খাও। তোমার বাচ্চাকে আমি নিচ্ছি। আমার নিজেরও ছেলেপুলে ছিল, তাদের কেমন করে রাখতে হয় আমি জানি।"

স্ত্রীলোকটি ঈশ্বরকে স্মরণ করে টেবিলে বসে খেতে শুরু করে দিল। এবডিশ বাচ্চাকে নিয়ে বিছানায় বসল। এবডিশের কোলে বসে শিশুটি হাসতে লাগল। এবডিশও ভারি খুশি। এদিকে স্ত্রীলোকটি খেতে–খেতেই তার নিজের কথা বলতে লাগল—সে কে বা কোথায় যাচ্ছে।

"আমি একজন সৈনিকের স্ত্রী। আটমাস আগে আমার স্বামীকে কোথায় কোন্ দূরদেশে পাঠিয়েছে, সেই থেকে তার কোনও খবর নেই। বাচ্চা হবার আগে আমি রাঁধুনির কাজ করেছি—কিন্তু বাচ্চা হবার পর তারা আর আমাকে রাখল না। ঘটনা তিনমাস আগের। তখন থেকে আমার কোনও কাজ নেই। যা–কিছু সঞ্চয় ছিল ফুরিয়ে গেছে। একজন ব্যবসায়ীর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম, সেখানে আমার ঠাকুরমা কাজ করে। তিনি কথা দিয়েছিলেন আমাকে নেবেন, আমিও তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু আজ সেখানে যেতে তিনি পরের সপ্তাহে আসতে বললেন। এখান থেকে অনেক দূরে তিনি থাকেন। শুধু–শুধু আমি নিজেও হেঁটে মরলাম, বাচ্চাটাকেও ভোগালাম। তবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমার বাড়িআলি আমার প্রতি সদয়, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনি আমাদের থাকতে দিয়েছেন। নইলে কোথায়–যে মাথা গুঁজতাম জানি না।"

এবডিশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোমার কি গরম জামা–কাপড় কিছুই নেই?"

স্ত্রীলোকটি এগিয়ে এসে বাচ্চাটাকে কোলে নিল। এবডিশ উঠে আলমারির কাছে গিয়ে অনেক খুঁজে–পেতে একটা পুরানো জামা নিয়ে ফিরে এল। বলল, "এই নাও। এটা খুব পুরানো, তাহলেও তোমার শরীরটা ঢাকতে পারবে।"

স্ত্রীলোকটি একবার জামাটার দিকে তাকাল, একবার বুড়োমানুষটির দিকে, তারপর জামাটা নিল, এবং হঠাৎ করেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

এবডিশ মুখ ঘুরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নিচে গেল। সেখান থেকে একটা পুরনো তোরঙ টেনে বের করে কী যেন হাতড়াতে লাগল তার ভেতর। তারপর স্ত্রীলোকটির সামনে গিয়ে বসল।

তখন স্ত্রীলোকটি তাকে বলল, "দাদু, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুক। নিশ্চয়ই তিনি আমাকে আপনার জানালার কাছে পাঠিয়েছিলেন। না হলে তো ঠাণ্ডায় এই বাচ্চার মৃত্যু আমাকে দেখতে হত। আমি যখন বেরিয়ে আসি তখন আবহাওয়া গরম ছিল। এখন তো

ঠাণ্ডায় সব জমে যাচ্ছে। কিন্তু তিনিই আমাকে আপনার জানালার কাছে এনে দিয়েছেন যাতে আমার দুরবস্থা দেখে আমার উপর আপনার দয়া হয়।"

এবডিশ হেসে বলল, "এ-কথা ঠিক যে তিনিই আমাকে ওখানে বসিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ভালোমানুষের মেয়ে, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই আমি বাইরে তাকিয়েছিলাম।"

এবডিশ তখন সৈনিকের স্ত্রীর কাছে সব খুলে বলল—তার স্বপ্নের কথা, সেদিন তার কাছে আসবার যে-প্রতিশ্রুতি প্রভু তাকে দিয়েছিলেন তার কথা।

"সে তো হতেই পারে," এই কথা বলে স্ত্রীলোকটি উঠে দাঁড়িয়ে জামাটা নিল, তা দিয়ে বাচ্চাটাকে জড়াল। তারপর আবার তাকে অভিবাদন জানিয়ে ধন্যবাদ দিল।

"যিশুর নামে এটাও নাও" বলে এবডিশ তার হাতে একটা দুই 'গ্রিভেংকা' দিল।

স্ত্রীলোকটি ক্রুশচিহ্ন আঁকল। এবডিশ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বিদায় দিল তাকে।

স্ত্রীলোকটি চলে গেলে এবডিশ সামান্য ঝোল খেল, বাসনপত্র পরিষ্কার করল, কাজে বসল তারপর। সারাক্ষণ কিন্তু চোখ তার জানালার দিকেই। যখনই সেখানে কোনো ছায়া পড়ে অমনি সে চোখ বড়িয়ে দেখে কে যাচ্ছে।

এমন সময় হঠাৎ কী যেন তার নজরে পড়ল। তার জানালার উল্টোদিকে একটি বুড়ি ফেরিঅলি এসে দাঁড়িয়েছে একঝুড়ি আপেল নিয়ে। আপেল প্রায় সবই বিক্রি হয়ে গেছে, ঝুড়িতে পড়ে আছে সামান্য কয়েকটা। তার কাঁধে এক ছালাভর্তি কাঠের টুকরো ; বেশ বোঝা যাচ্ছে বোঝাটা তার ঘাড়ে খুব ভারী হয়েই চেপেছে। সেটাকে ঘাড় বদলাবার জন্যই সে দাঁড়িয়েছে। বুড়ি যখন তার ছালা বদলাতে ব্যস্ত তখন কোথা থেকে ছেঁড়া টুপি মাথায় একটা ছেলে ছুটে এসে ঝুড়ি থেকে একটা আপেল তুলে নিল। যেই পালাতে যাবে অমনি বুড়ি মুখ ফিরিয়ে তার জামার আস্তিন টেনে ধরল।

ছেলেটা হাতের মুঠো ছাড়িয়ে চেষ্টা করল পালাতে। কিন্তু বুড়ি তার টুপিটা ফেলে দিয়ে ধরল চুলের মুঠি। চিৎকার করতে লাগল ছেলেটা। বুড়িও গালাগাল দিতে লাগল।

সেলাইয়ের কাজ মেঝের উপর ফেলে এবডিশ একলাফে দরজার কাছে গিয়ে হাজির। দৌড়ে রাস্তায় গিয়ে দেখল, স্ত্রীলোকটি ছেলেটির চুলের মুঠি ধরে টানছে আর গালাগালি দিচ্ছে, তাকে পুলিশে দেবে বলে ভয় দেখাচ্ছে ; আর ছেলেটা নিজেকে ছাড়াবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে। সে বারবার বলছে, "আমি কক্ষনো নিইনি, কেন আমাকে মারছ? আমাকে ছেড়ে দাও !"

এবডিশ দুজনকে সরিয়ে দিয়ে ছেলেটার হাত ধরে বলল, "দিদিমা, ওকে ছেড়ে দাও। ঈশ্বরের দোহাই, ওকে ক্ষমা করো, সব ভুলে যাও।"

"আমি ওকে এমন শিক্ষা দিয়ে দেব যা ও জীবনে ভুলবে না ! ও-মড়াকে আমি পুলিশে দেব !"

এবডিশ তবু অনুনয় করে বলল, "ওকে ছেড়ে দাও দিদিমা, এমন কাজ ও আর কখনও করবে না। যিশুর দোহাই, ওকে ছেড়ে দাও।"

বুড়ি ওকে ছেড়ে দিল। কিন্তু ছেলেটা দৌড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই এবডিশ তাকে ধরে ফেলল। বলল, "বুড়ির কাছে ক্ষমা চা ! বল্, আর কখনও এ-কাজ করবি না ! আমি নিজে তোকে আপেলটা নিতে দেখেছি।"

ছেলেটা কেঁদে ফেলল। কিন্তু উপায় না-থাকায় এবডিশের কথামতো বুড়ির কাছে ক্ষমা চাইল।

এবডিশ বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। এইবার আমি তোকে একটা দিচ্ছি। এই নে।"

ঝুড়ি থেকে একটা আপেল নিয়ে সে ছেলেটাকে দিল। বুড়িকে বলল, "এটার পয়সা আমি তোমাকে দেব গো ভালোমানুষের মেয়ে।"

বুড়ি বাধা দিল : "ঠিক আছে। কিন্তু এই করে তুমি খুদে শয়তানটার মাথা খাচ্ছ। ওকে এমন পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল যা ও সাতদিনেও ভুলত না।"

এবডিশ বলে উঠল, "আহা ভালোমানুষের মেয়ে, আমাদের পুরস্কারের ব্যবস্থাটা হয়তো ওরকম হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের ব্যবস্থা তা নয়। আপেলটা নেবার জন্য ছেলেটাকে যদি চাবুক মারা হয়, তাহলে আমাদের পাপের জন্য কি আমাদেরও শাস্তি পাওয়া উচিত নয়?"

বুড়ি চুপ করে গেল। তখন এবডিশ বুড়িকে সেই উপাখ্যানটা বলল যাতে আছে যেভাবে এক মনিব তার চাকরকে অনেক টাকা ঋণ মকুব করে দিয়েছিল, অথচ সেই অকৃতজ্ঞ চাকর সেখান থেকে গিয়ে তার নিজের খাতকের গলা টিপে ধরেছিল।

বুড়ি শুনল, ছেলেটাও শুনল। এবডিশ বলতে লাগল, "ঈশ্বর আমাদের বলেছেন পরস্পরকে ক্ষমা করতে, নইলে তো তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন না!

বুড়ি ঘাড় নাড়ল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তা হতে পারে। কিন্তু এই খুদে শয়তানগুলো যে একেবারে গোল্লায় গেছে!"

এবডিশ বলল, "তাহলেও তো আমাদের মতো বড়দেরই কাজ হল ওদের শিখিয়ে-পড়িয়ে ভালো করে তোলা।"

বুড়ি এবার যোগ দিল, "এ-কথা তো আমিও অনেক সময় বলি। একসময়ে বাড়িতে আমার সাতটা ছেলেমেয়ে ছিল। এখন শুধু একটা মেয়ে বেঁচে আছে।"

তারপর সে বলতে লাগল—সে ও তার মেয়ে কোথায় থাকে, কী করে, তার কতগুলো নাতি-নাতনি আছে—সব।

"আমার তো শরীরের এই হাল দেখছ, তবু আমি খুব খাটি, খাটি আমার ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনিদের জন্য। বড় ভালো ওরা। ওদের মতো কেউ আমাকে ভালোবাসে না। ঠাক্‌মা ঠাক্‌মা করে একেবারে পাগল।"

বুড়ির মনটা বেশ নরম হয়ে এসেছিল, এমন সময় ছেলেটা ছুটে এসে বলল, "ওটা আমাকে দাও দাদিমা, আমিও ওই পথেই যাব।"

বুড়ি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল, ছালাটা ঘাড়ে তুলে দিল ছেলেটার, তারপর দুজনে রাস্তা ধরে চলে গেল। এবডিশের কাছ থেকে আপেলের দাম চেয়ে নিতেও ভুলে গেল বুড়ি।

ওরা চলে গেলে এবডিশ ঘরে ফিরে এল। সুচটা হাতে নিয়ে আবার সে বসে গেল কাজে। বাইরে চেয়ে দেখল, রাস্তার আলো জ্বালাতে বাতিঅলা এসে গেছে। সে ভাবল, আমাকেও তো আলো জ্বালাতে হবে। তখন সে বাতিটা উস্কে দিল, তারপর সেটা ঝুলিয়ে দিয়ে আবার মন দিল কাজে। একটা জুতো শেষ করে দেখল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। না, বেশ ভালোই হয়েছে। তারপর যন্ত্রপাতি গুছিয়ে, টুকরো-টাকরা যা পড়ে ছিল ঝাঁট দিয়ে, সুচ-সুতো তুলে বাতিটা এনে টেবিলের উপর রাখল এবং তাকের উপর থেকে 'ধর্মগ্রন্থ'-খানা পেড়ে নিল। ইচ্ছা ছিল, আগের দিন যে-জায়গাটায় একফালি চামড়া দিয়ে চিহ্ন রেখেছিল বইয়ের সেই জায়গাটাই খুলবে, কিন্তু খুলল অন্য জায়গা। বইটা খুলতেই এবডিশের স্বপ্নের কথা মনে পড়ে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কার পায়ের শব্দ কানে এল তার। কে যেন তার পিছনে এসে দাঁড়াল।

পিছনে তাকাতে তার মনে হল, অন্ধকার কোণটায় কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে। অথচ

তাদের চেহারা সে ঠিক ঠাহর করতে পারছে না।

কে যেন তার কানে চুপি-চুপি বলল, "মার্টিন, মার্টিন, আমাকে চিনতে পারছ না?"

মার্টিন বলল, "কে?"

কণ্ঠস্বর বলল, "আমি। আমি গো।"

অন্ধকার কোণ থেকে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল বুড়ো স্তেপানিচ। আবার হাসল সে। তারপর মেঘের মতো মিলিয়ে গেল। আর তাকে দেখা গেল না।

আর-একটি কণ্ঠস্বর বলল, "আমি গো।" সেই স্ত্রীলোকটি বাচ্চা কোলে করে অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এসে হাসতে লাগল। বাচ্চাটাও হেসে উঠল। তারপর তারাও অদৃশ্য হয়ে গেল।

"আরে এই তো আমি", আর-একটি কণ্ঠস্বর বলল। সেই বুড়ি, আর আপেল হাতে ছেলেটা এগিয়ে এল। তারাও অদৃশ্য হয়ে গেল হাসতে হাসতে।

খুশিতে ভরে গেল এবডিশের মন। সে ঈশ্বরকে স্মরণ করে চোখে চশমা পরে বইয়ের একটা পাতার একেবারে উপর থেকে জোর গলায় পড়তে লাগল :

"আর আমার ক্ষুধা পেলে তুমি খেতে দিলে, তৃষ্ণা পেলে পানীয় দিলে ; আমি অপরিচিত, তবু তুমি আমাকে ভিতরে ডাকলে।"

সেই পাতার নিচের দিকে পড়ল এবডিশ :

"যেহেতু আমার একটি ভাইয়ের জন্য তুমি এসব করেছ, এসব তুমি আমার জন্যই করেছ।"

তখন এবডিশ বুঝতে পারল, তার স্বপ্ন তাকে প্রতারণা করেনি, সৃষ্টিকর্তা সেদিন সত্যি তার কাছে এসেছিল, আর সেও সত্যি তাঁকে জানিয়েছিল সাদর অভ্যর্থনা।

ঈশ্বর সবই দেখতে পান

ভ্লাদিমির শহরে বাস করত আকসিয়নভ নামে এক তরুণ ব্যবসায়ী। দুটো দোকান আর একটা বাড়ির মালিক সে। মাথায় তার কোঁকড়ানো চুল। শিরের রঙ কেমন টকটকে লাল, চেহারাটাও ভারি সুন্দর।

আকসিয়নভ বেজায় আমুদে লোক, গানবাজনা করতে খুব ভালোবাসত। ছোটবেলা থেকেই সে ভদ্‌কা খেতে আরম্ভ করে এবং নেশার মাত্রা বেশি হলে সে অনেকের সঙ্গেই ঝগড়াঝাঁটিও বাধাত। কিন্তু বিয়ে করার পর থেকে আকসিয়নভ ভদ্‌কা খাওয়া প্রায় ছেড়ে দিল।

গ্রীষ্মের সময় একদিন দূরের এক শহরে যাবে বলে সে তৈরি হল। কিন্তু তার স্ত্রী এসে বলল, আজকে তুমি যেও না। তোমার সম্বন্ধে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি আমি।

তার কথা শুনে আকসিয়নভ হেসে উঠল। তোমার ভয়, আমি শহরে গেলেই খুব করে নেশা শুরু করব, এই তো?

স্ত্রী জবাব দিল, ভয়টা যে কিসের তা বুঝতে পারছি না। আমি স্বপ্নে দেখেছি, তাই বলছি। স্বপ্নে দেখেছি, তুমি শহর থেকে ফিরে এসে মাথার টুপিটা খুলতেই দেখতে পেলাম, তোমার মাথার চুলগুলো সব শাদা ধবধবে হয়ে গেছে।

আকসিয়নভ আবার হেসে উঠল। বলল, সে তো ভাগ্যের লক্ষণই হল। দেখবে তুমি, সব জিনিশপত্র বিক্রি করে তোমার জন্যে উপহার-সামগ্রী কিনে ফিরে আসব।

এই বলে বিদায় নিয়ে সে রওনা হয়ে গেল।

অর্ধেকটা পথ যাবার পরে দেখা হল আর-একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে। ব্যবসায়ী তার পরিচিত। দুজনে তারা একত্রে সরাইখানায় রাত কাটাবে ঠিক করল। রাত্রে একত্রে চা খেয়ে তারা পাশাপাশি কামরায় শুতে গেল।

বেশি বেলা পর্যন্ত শুয়ে-থাকা আকসিয়নভের অভ্যাস নয়। বেশ ঠাণ্ডা থাকতে-থাকতে পথে বেরোবে মনে করে ভোর হবার বেশকিছু আগেই সে গাড়োয়ানকে ডেকে গাড়িতে ঘোড়া জুড়তে বলল। তারপর সরাইখানার মালিকের কাছে গিয়ে পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়ে আবার পথে নেমে পড়ল।

প্রায় মাইল পঁচিশেক যাবার পর সে আরেকটি সরাইখানায় গিয়ে থামল। একজন

অফিসার গাড়ি থেকে নেমে এলেন, তার পেছনে নামল দুজন সৈনিক। নেমেই অফিসারটি আকসিয়ানভের দিকে এগিয়ে এসে তার পরিচয় এবং কোথা থেকে এসেছে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

সবগুলো প্রশ্নের ঠিক জবাব দিয়ে আকসিয়নভ তাঁকে খাতির দেখিয়ে বলল, আসুন ভেতরে বসে একসঙ্গে চা খাওয়া যাবে।

কিন্তু সে-কথার জবাব না দিয়ে অফিসারটি পাল্টা প্রশ্ন করে চললেন, গতরাত্রে আপনি কোথায় ছিলেন? একলাই সেখানে ছিলেন, না আর-কোনো ব্যবসায়ী সঙ্গে ছিল? আজ ভোরে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে কি? ভোর না-হতেই আপনি সেই সরাইখানা ছেড়ে চলে এলেন কেন?

এভাবে জেরা করায় আকসিয়নভ মনে মনে খুব বিস্মিত হল, কিন্তু তবু প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে বলল, আপনি আমাকে জেরা করছেন এমনভাবে যেন আমি একটা চোর। আমি ব্যবসায়ের কাজে বিদেশে বের হয়েছি, কাজেই এসব জিজ্ঞাসাবাদ কেন তা তো বুঝতে পারছি না।

সৈনিক দুজনকে কাছে ডেকে অফিসার তখন বললেন, আমি এ-জেলার পুলিশ কর্মচারী। আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদের কারণ, যে-ব্যবসায়ীটির সঙ্গে আপনি রাত কাটিয়েছেন তাকে আজ ভোরে গলাকাটা অবস্থায় পাওয়া গেছে। আমরা আপনার জিনিশপত্র তল্লাশি করব।

এই বলে তারা ঘরে গিয়ে ঢুকল। পুলিশ-কর্মচারী সৈনিক দুজনসহ আকসিয়ানভের মালপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ ব্যাগের ভেতর থেকে একটা ছুরি বের করে বলে উঠলেন, এ ছুরি কার?

আকসিয়নভ চেয়ে দেখল তার ব্যাগের ভেতর থেকে বেরিয়েছে রক্তমাখা একটা ছুরি। দেখে সে ভয় পেয়ে গেল।

কর্মচারীটি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ছুরির গায়ে রক্ত লেগে থাকার কারণ কী?

আকসিয়নভ জবাব দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু কথা তার গলায় আটকে যেতে লাগল। অতি কষ্টে ফিস্‌ফিস্ করে সে বলল, আমি কিছুই জানি না, এ ছুরি আমার নয়—।

তখন অফিসারটি আবার বললেন, ভোরে সেই ব্যবসায়ী লোকটিকে গলাকাটা অবস্থায় বিছানায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে। আপনিই হলেন একমাত্র লোক যাকে দিয়ে এ-কাজ সম্ভব। বাড়িটা ভেতর থেকে তালাবন্ধ ছিল এবং ভেতরেও আর কেউ ছিল না। তাছাড়া আপনার ব্যাগে রয়েছে রক্তমাখা ছুরি। আপনার মুখচোখের হাবভাব থেকেই অপরাধ প্রমাণ হচ্ছে। বলুন, কীভাবে খুন করেছেন, আর কত রুবল নিয়েছেন।

আকসিয়নভ শপথ করে বলল, আমি এ ঘৃণিত কাজ করিনি। একসঙ্গে বসে চা খাওয়ার পরে আমি আর তাকে দেখিনি। আমার সঙ্গে নিজের আটহাজার রুবল ছাড়া আর কোনো কিছু নেই। ছুরিটা আমার নয়।

কথা বলতে গিয়ে গলার স্বর তার কাঁপছিল। মুখ ফ্যাকাশে। অপরাধীর মতোই সে ভয়ে কাঁপছিল।

পুলিশ-কর্মচারী আকসিয়নভকে হাতকড়া পরিয়ে গাড়িতে তোলার হুকুম দিলেন। সৈনিকরা আকসিয়নভকে হাত-পা বেঁধে গাড়িতে তুলতেই সে কেঁদে ফেলল। তার সব টাকা-পয়সা এবং মালপত্র নিয়ে নিকটবর্তী শহরে তাকে কয়েদ রাখা হল। তারপর তার চরিত্র সম্বন্ধে খোঁজখবর নেয়া হতে লাগল।

তার নিজ শহরের সব অধিবাসী ও ব্যবসায়ীরা একবাক্যে বলল, একসময়ে আকসিয়নভ্ ভদ্‌কা খেত এবং কিছুই না করে সময় কাটাত। কিন্তু সেসব অনেক আগের কথা। এখন সে অপর দশজনের মতোই একজন ভালো লোক।

বিচার শুরু হল। আকসিয়ানভের বিরুদ্ধে অভিযোগ সে একজন ব্যবসায়ীকে খুন করে তার বিশহাজার রুবল আত্মসাৎ করেছে।

আকসিয়ানভের স্ত্রী দুঃখে ও দুর্ভাবনায় হতভম্ব হয়ে গেছে। কার কথা বিশ্বাস করবে? ছেলেমেয়েরা সব ছোট ছোট। তাদের সঙ্গে নিয়েই সে শহরে গেল স্বামীর সঙ্গে একটিবার দেখা করতে। প্রথমে তাকে দেখা করার অনুমতি দেয়া হল না। অনেক কাকুতি–মিনতি আর কান্নাকাটির পরে অনুমতি পাওয়া গেল।

তাকে হাজির করা হল কয়েদখানায় স্বামীর কাছে। স্বামীকে কয়েদির পোশাকে হাত–পা বাঁধা অবস্থায় চোর–ডাকাত–খুনীদের সঙ্গে দেখে আকসিয়ানভের স্ত্রী জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। অনেকক্ষণ পরে ছেলেমেয়েদের কাছে টেনে এনে স্বামীর পাশে বসে সে সংসারের হালচাল বলল। কীভাবে কী হয়েছে স্বামীর কাছে তাও সে জিজ্ঞেস করল। সব কথাই আকসিয়নভ খুলে বলল। সেসব শুনে স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, আমরা এখন তোমার জন্যে কী করতে পারি?

আকসিয়নভ সে–কথার জবাব না দিয়ে মাটির দিকে চেয়ে রইল। তার স্ত্রী বলল, আমি যে স্বপ্নে দেখেছিলাম তোমার চুলগুলো সব শাদা হয়ে গেছে, সেটা তাহলে মিছে নয় বুঝতে পারছি। তোমার মনে আছে সে–কথা? সেদিন তোমার রওনা হওয়া উচিত হয়নি।

তারপর স্বামীর চুলগুলো আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সে বলল, আমাকে সত্যি কথা বলো। তুমি কি এ–কাজ করেছ?

'তাহলে তুমিও শেষটায় আমাকে অবিশ্বাস করছ?' বলেই সে দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল। ঠিক সেই সময় একজন সৈনিক এসে বলল, আকসিয়ানভের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের এখনই চলে যেতে হবে। আকসিয়নভ শেষবারের জন্যে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কাছে বিদায় নিল।

তারা চলে গেলে আকসিয়নভ মনে–মনে কথাগুলো আবার ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে যখন মনে হল স্ত্রী তাকে অবিশ্বাস করেছে তখন সে আপনমনেই বলে উঠল, এখন বুঝতে পারছি, প্রকৃত সত্য শুধু ঈশ্বরই জানতে পারেন! তার কাছেই আমরা প্রার্থনা করতে এবং ক্ষমা ভিক্ষে করতে পারি।

এরপর মুক্তির সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়ে আকসিয়নভ শুধু ঈশ্বরকে ডাকতে লাগল।

বিচারে আকসিয়নভকে চাবুক মেরে খুনির সাজে পাঠিয়ে দেবার হুকুম হল। চাবুকের ঘা শুকিয়ে গেলে অন্য কয়েদিদের সঙ্গে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হল সাইবেরিয়ায়।

দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর আকসিয়নভ সাইবেরিয়ায় কয়েদি জীবন যাপন করল। তার মাথার চুল এবার সত্যিই তুষারের মতো শাদা হয়ে গেছে, লম্বা দাড়ি গজিয়েছে মুখে। ধীরেধীরে পা ফেলে সে হাঁটে, কথা বলে খুবই কম, হাসে না একটুও, রাতদিন শুধু প্রার্থনা করে।

তার নম্র স্বভাবের জন্যে জেলের কর্তারা সবাই ভালোবাসত, কয়েদিরা করত সম্মান। তাকে আদর করে তারা 'বুড়ো দাদু' বলে ডাকত। তাদের ভেতর কখনো ঝগড়া বাধলে আকসিয়নভের কাছে আসত ঝগড়া মিটিয়ে নিতে।

আকসিয়নভের বাড়ি থেকে আর কোনও খবরই পাওয়া গেল না। তার স্ত্রী–পুত্র বেঁচে আছে কি না তাও সে বলতে পারে না।

একদিন নতুন একদল কয়েদি এল সাইবেরিয়ার জেলে। সন্ধ্যায় পুরানো কয়েদিরা নতুনদের নিয়ে ঘিরে বসল। আলাপ–পরিচয় করতে লাগল কে কোথা হতে এসেছে, কার কী অপরাধ, এইসব আলাপ। তাদের সঙ্গে আকসিয়নভও এসে বসেছে। বিমর্ষভাবে বসে–বসে শুনছে তাদের কথাবার্তা।

একজন কয়েদি, ষাট বছর তার বয়স। দেখতে যেমন লম্বা তেমনি দশাসই শরীর। মুখে শাদা দাড়ি। তাকে কীভাবে গ্রেফতার করে এনেছে সেই গল্পই সে শোনাচ্ছিল সবাইকে।

সে বলছিল, ভাইসব ! আমাকে গ্রেফতার করেছে আমি একজনের একটা ঘোড়া ধার করে নিয়েছিলাম বলে। ঘোড়াটা গাড়ির সঙ্গে জোড়া ছিল। কত করে বললাম যে ঘোড়াটা আমি নিয়েছিলাম শুধু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবার জন্যে। বাড়ি গিয়েই সেটা ফিরিয়ে দিতাম। তাছাড়া দারোয়ানও ছিল আমার একজন বন্ধু। আমি তাকে বললাম, এতে আর এমন কী দোষ করেছি?

কিন্তু তারা সবাই বলল, না, তুমি চুরি করেছ।

কোথায় কীভাবে আমি চুরি করলাম কেউ তা বলতে পারল না। একবার অবশ্যি আমি সত্যি একটা ভয়ানক অন্যায় কাজ করেছিলাম এবং সেই অপরাধে আগেই আমার এখানে আসা উচিত ছিল। কিন্তু সেবার আমি ধরা পড়িনি। এবার আমাকে ধরেছে বিনা–অপরাধে।

'কোথা থেকে তুমি এসেছ?' কয়েদিদের একজন তাকে জিজ্ঞেস করল।

সে বলল, এসেছি ভ্লাদিমির থেকে। আমি সেই শহরেরই বাসিন্দা। আমার নাম মাকার। কেউ কেউ আমাকে সেমেনিচ বলেও ডাকে ! আকসিয়নভ্ মাথা তুলে জিজ্ঞেস করল, বলো তো সেমেনিচ, তোমাদের ভ্লাদিমির শহরে ব্যবসায়ী আকসিয়নভের খবর কী? তাদের কেউ কি এখনও বেঁচে আছে? তুমি তাদের চিনতে?

তাদের কথা কে না জানে?—নিশ্চয়ই চিনি। আকসিয়নভেরা খুব ধনীলোক, যদিও তাদের বাবা আছে এই সাইবেরিয়ারই জেলে। হয়তো সেও আমাদের মতোই একজন পাপী। আচ্ছা তুমি এখানে কী করে এলে বুড়ো দাদু?'

আকসিয়নভ তার দুর্ভাগ্যের কথা নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহবোধ করে না। সে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, আমার পাপের জন্যে এই ছাব্বিশ বছর এখানে পড়ে আছি।

'কী পাপ?' মাকার সেমেনিচ জিজ্ঞেস করল।

কিন্তু আকসিয়নভ্ তার জবাব না দিয়ে শুধু বলল, হয়তো এই সাজা আমার পাওনা ছিল।

এই বলে সে চুপ করে রইল। তার সঙ্গীরা কিন্তু সব কথাই নতুন কয়েদিটাকে খুলে বলল। কীভাবে একটা লোক একজন ব্যবসায়ীকে খুন করে ছুরিটা আকসিয়নভের থলের ভেতর রেখেছিল এবং কীভাবে আকসিয়নভকে এখানে আসতে হল কিছুই তারা বলতে বাকি রাখল না।

সব কথা শুনে মাকার আকসিয়নভের দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে বলল, তাজ্জব ব্যাপার ! সত্যিই বড় তাজ্জব ব্যাপার ! কিন্তু কীরকম বুড়ো হয়ে গেছ তুমি !

সবাই তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, তুমি এত আশ্চর্য হচ্ছ কেন? এর আগে কোথায় তুমি আকসিয়নভকে দেখেছ?

কিন্তু মাকার সেসব কথার জবাব দিল না। সে শুধু বলল, এভাবে এখানে আমাদের দেখা

হওয়াটা সত্যি এক আজব ব্যাপার!

মাকারের মুখে এ-কথা শুনে আকসিয়নভের মনে হল, লোকটা বোধহয় আসল খুনীকে চেনে। সে তাই জিজ্ঞেস করল, সম্ভবত তুমি ব্যাপারটা শুনেছিলে এবং আমাকে এর আগে কোথাও দেখেছিলে?

'না-শুনে উপায় কী বলো। এ-কথা তো তখন জগৎময় রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সেসব অনেককাল আগের কথা। যা-কিছু শুনেছিলাম তার অনেক কিছুই আজ ভুলে গেছি।'

'সম্ভবত সওদাগরকে কে মেরেছিল তা তুমি শুনেছিলে।' আকসিয়নভ জিজ্ঞেস করল।

মাকার সেমেনিচ হেসে বলল, যার থলের ভেতর থেকে ছুরি বেরিয়েছে সেই নিশ্চয় খুন করেছে। অপর কেউ যদি ছুরিটা রেখেও থাকে তবু ধরা না-পড়া অবধি সে দোষী নয়। তোমার মাথার নিচে যে-থলে রাখা ছিল তার ভেতর অন্য কেউ এসে ছুরি রাখবে কী করে? রাখতে গেলে নিশ্চয়ই তোমার ঘুম ভেঙে যেত?

এসব কথায় আকসিয়নভের সন্দেহ হল, নিশ্চয়ই এ-লোকটি সওদাগরকে খুন করেছে। আকসিয়নভ উঠে ধীরেধীরে সেখান থেকে চলে গেল। সারারাত চোখে ঘুম এল না। সারা দুনিয়ার দুঃখের বোঝা যেন সে-রাতে তার বুকে চেপে বসল। অতীতের কত ছবি ফুটে উঠল তার চোখের সামনে। বাড়ি থেকে বিদায়ের সময় তার পরিবারের ছবি। স্ত্রীকে যেমনটি দেখেছিল বিদায় নেবার সময়। সে যেন জীবন্ত হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল—সেই চোখ, সেই মুখ, তার হাসি ও কথা যেন কানে বাজতে লাগল। তারপর তার ছেলেমেয়ে। তখন একেবারেই ছোট সেসব ছেলেমেয়ে। একজনের গায়ে ছোট্ট একটি কোট, আরেকজন তার মায়ের কোলে দুধ খাচ্ছে। তারপর মনে পড়ল তার নিজের শৈশবের কথা, যৌবনের কথা। কী নির্ভাবনা আর আনন্দেই-না তার দিনগুলো কেটেছে। গ্রেফতারের সময়কার কথাও তার মনে পড়ল। তারপরে সেই চাবুক মারার কথা। কোথায় কোথায় আঘাত লেগেছিল আজ আবার মনে পড়ল। মনে পড়ল জেলের ছাব্বিশ বছরের দুর্ভোগের কথা। এসব চিন্তা তাকে এমন করে তুলল যে, তার ইচ্ছে হল আত্মহত্যা করে সকল দুঃখের অবসান ঘটায়।

ভাবতে ভাবতে আপনমনেই সে বলল, এসবের মূলেই সেই শয়তান লোকটা যে নিজে খুন করে দোষ চাপিয়েছে আমার ঘাড়ে। মাকার সেমেনিচের কথা মনে পড়তেই তার রাগ বেড়ে গেল। জীবন গেলেও প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে। বাকি রাত সে প্রার্থনা করে কাটাল। কিন্তু এতটুকুও শান্তি এল না তার মনে। দিনের বেলা সে মাকার সেমেনিচের ধারেকাছেও গেল না। ফিরেও তাকাল না তার দিকে।

একরাত্রে সে যখন জেলখানার ব্যারাকের পাশ দিয়ে জেলের ভেতর পায়চারি করছিল তখন দেখতে পেল, কতগুলো মাটি গড়িয়ে পড়ল একটা বাংকের নিচ থেকে। বাংকগুলোতে কয়েদিরা ঘুমোয়। ব্যাপারটা কী ভালো করে দেখার জন্যে সে থমকে দাঁড়াল। এমন সময় বাংকের নিচ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে ভয়ে-ভয়ে একজন আকসিয়নভের দিকে চেয়ে রইল। আকসিয়নভ তার দিকে ফিরে না-চেয়েই চলে যাচ্ছিল কিন্তু মাকার তার হাত চেপে ধরল। বলল, আমি দেয়ালের নিচে একটা গর্ত খুঁড়ছি। প্রত্যেকদিন কাজে যাওয়ার সময় আমি মাটি খুঁড়ে বুটজুতোর ভেতর বোঝাই করে বাইরে নিয়ে যাই। বাইরে নিয়ে সেই মাটি ফেলে দিই।

তারপরে আবার বলল, কিন্তু তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, তুমি এ-বিষয়ে টুঁ-শব্দটি করবে না কারও কাছে। তাহলে তুমিও আমার সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারবে। আর যদি

কর্তাদের কাউকে বলো, তারা আমাকে চাবুক মেরেই শেষ করবে কিন্তু তার আগে আমি খুন করব তোমাকে, তা মনে রেখো।

শয়তানটার দিকে চেয়ে আকসিয়নভের সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল অসহ্য রাগে। সে তার হাত ছাড়িয়ে বলল, আমার মুক্তি পাবার কোনো ইচ্ছে নেই, তোমারও কোনো দরকার হবে না আমাকে খুন করবার। আমাকে তুমি অনেক আগেই খুন করেছ! কর্তাদের বলার কথা বলছ?—তা বলতেও পারি, নাও বলতে পারি। ঈশ্বরের যা ইচ্ছে তাই পূর্ণ হবে।

পরের দিন। কয়েদিদের বাইরে নেয়া হচ্ছে কাজে লাগাবার জন্যে। কোনো-একজন কয়েদিকে যেন দেখা গেল, চুপিচুপি সে নিজের পায়ের জুতো খুলে তার ভেতর থেকে কতগুলো মাটি ঝেড়ে ফেলছে। সেইদিনই তন্নতন্ন করে খোঁজা হল জেলখানা। খুঁজেখুঁজে অবশেষে সেই সুড়ঙ্গটা পাওয়া গেল একজায়গায় দেয়ালের নিচে। কে এ-কাজ করেছে? কার এত সাহস? একে একে সবাইকে জিজ্ঞেস করা হল, কেউ অপরাধ স্বীকার করল না। সবশেষে জেলের বড়কর্তা মুখ ঘোরালেন আকসিয়নভের দিকে। তিনি জানেন এই একটি সৎলোক আছে এতগুলো লোকের ভেতর। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি সত্যবাদী বুড়ো মানুষ। ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে তুমিই বলো, কে এ অন্যায় করেছে।

মাকার সেমেনিচ সামনেই দাঁড়িয়ে আছে এমন নির্বিকারভাবে যেন কিছুই সে শুনতে পায়নি অথবা কিছুই যেন ঘটেনি। আকসিয়নভের ঠোঁট আর হাত কেঁপে উঠল। অনেকক্ষণ অবধি সে কথাই বলতে পারল না। সে ভাবছিল, যে আমার জীবন ধ্বংস করেছে তাকে আমি রক্ষা করব কেন? আমার যন্ত্রণার দাম সে দিক। কিন্তু সব যদি বলি, হয়তো চাবুক মেরে-মেরে তাকে মেরেই ফেলবে এবং এমনও হতে পারে, আমি যে তাকে সন্দেহ করেছি তা অমূলক। তাছাড়া বড় কথা হল, আমার দুঃখ কি কমবে এতে?

বড়কর্তা তাকে নির্বাক দেখে আবার বললেন, কি হে বুড়ো, সত্যি বলো। যা জানো বলে ফেল। কে গর্ত খুঁড়েছে?

আকসিয়নভ মাকার সেমেনিচের দিকে একবার চেয়ে বলল, আমি তা বলতে পারি না হুজুর। ঈশ্বরের ইচ্ছে নয় যে আমি তা বলি। আমি আপনার অধীন, আমাকে যা-খুশি করতে পারেন, আমি কিছু বলতে পারব না।

জেলের কর্তা কথা বের করতে যতই চেষ্টা করেন আকসিয়নভ ততই শক্ত হয়ে ওঠে। অবশেষে ব্যাপারটা সেখানেই শেষ হল।

সেই রাত্রে আকসিয়নভ বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছিল, এমন সময় কে একজন যেন নিঃশব্দে এসে বসল বিছানার পাশে। আকসিয়নভ বুঝতে পারল লোকটি মাকার ছাড়া আর কেউ নয়।

আবার আমার কাছে কী চাও তুমি? এসেছ কেন এখানে? আকসিয়নভ তাকে জিজ্ঞেস করল।

মাকার চুপ করে রইল। আকসিয়নভ উঠে বসে বলল, কী চাও তুমি? চলে যাও এখান থেকে, নইলে সৈন্যদের ডাকব এখখুনি।

মাকার সেমেনিচ মাথা নিচু করে চুপিচুপি বলল, আমাকে ক্ষমা করো আইভান দিমিত্রিস।

আকসিয়নভ জিজ্ঞেস করল, কোন্ অপরাধের ক্ষমা?

আমিই সেই সওদাগরকে খুন করে তোমার জিনিশপত্রের ভেতর ছুরিখানা লুকিয়ে

রেখেছিলাম। তোমাকেও আমি মারব বলেই মতলব করেছিলাম। ঠিক এমন সময় বাইরে একটা শব্দ হওয়ায় তাড়াতাড়ি আমি ছুরিখানা তোমার থলের ভেতর রেখে পালিয়ে যাই জানালা দিয়ে।

আকসিয়নভ চুপ করে রইল। কী বলবে সে যেন ভেবেই পাচ্ছিল না। মাকার বিছানাটা গুটিয়ে মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে বসে বলে উঠল, আইভান ভাই, আমাকে ক্ষমা করো। ঈশ্বরের নামে আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি স্বীকার করব যে, অপরাধ আমিই করেছিলাম, তুমি কোনও অপরাধ করোনি। তাহলেই তোমাকে মুক্তি দেবে এবং তুমি বাড়ি যেতে পারবে।

আকসিয়নভ বলল, তোমার পক্ষে এ-কথা বলা সহজ, কিন্তু তোমার জন্যেই এ সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বছর আমি জেলে পচে মরছি। আজ আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? আমার স্ত্রী মরে গেছে, ছেলেমেয়েরা আমাকে ভুলে গেছে, আমার যাবার জায়গা কোথাও নেই।

মাকার উঠল না, বরং মেঝেয় মাথা ঠুকে বলল, আমাকে মাপ করে দাও। তোমাকে দেখে যেমন কষ্ট হচ্ছে, জেলে আসার আগে ওদের হাতের চাবুক খেয়েও সেরকম কষ্ট আমার হয়নি। তুমি তবুও আমাকে দয়া করেছ, আমার দোষ ঢেকে রেখে সাজার হাত থেকে বাঁচিয়েছ! আহা হা! আমাকে ক্ষমা করো ভাই। এই হতভাগাকে ক্ষমা করো, ঈশ্বরের দোহাই! বলতে বলতে মাকার কেঁদে ফেলল!

আকসিয়নভ তখন বলল, তোমাকে ঈশ্বর ক্ষমা করবে। কে জানে হয়তো আমি তোমার চেয়েও শতগুণ খারাপ।

কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরে যেন আলো জ্বলে উঠল, বাড়িতে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা তার আর রইল না। কারাগার ত্যাগের কল্পনাও বিদায় নিল মন থেকে। সে শুধু তার শেষমুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

আকসিয়নভ মুক্তি পেতে চায় না জেনেও মাকার নিজের সমুদয় দোষ অকপটে স্বীকার করল। তার ফলে আকসিয়নভের মুক্তির আদেশ হল। কিন্তু তার মুক্তির সরকারি আদেশ যখন এসে কারাগারে পৌঁছল তখন সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে পরপারে চলে গেছে। আকসিয়নভ আর নেই।

কতটা জমি দরকার

এক

ছোট বোনের গ্রামের বাড়িতে শহর থেকে বেড়াতে এসেছে বড়বোন। বড়বোনের বিয়ে হয়েছে শহরে এক সওদাগরের সঙ্গে, আর ছোট বোনের হয়েছে গ্রামের এক কৃষকের সঙ্গে। দুজনে চা খেতে-খেতে গল্প করছিল। বড়বোন শহুরে জীবনের সুখ-সুবিধের কথা বলছিল ; সেখানে তাদের জীবন-যাপন কত আরাম-আয়েশের, ছেলেমেয়েদের নিত্যনতুন কত জামা-কাপড় পরাতে পারে, কত রকমের মজার মজার খাবার খায়, স্কেট করে, যখন যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায়, থিয়েটারে যায়। ...

বড়বোনের শহুরে আদিখ্যেতায় ছোটবোন কিন্তু ভারি বিরক্ত হল। সেও তাই শহুরে জীবনযাত্রার নিন্দে করে নিজের গ্রাম্যজীবনের খুব খানিকটা প্রশংসা করে ফেলল।

সে বলল, 'দেখ, যাই বলো না কেন, আমি কিন্তু কিছুতেই তোমার মতো হতে চাই না। অবশ্য তোমার এসব কথা আমি স্বীকার করি যে আমাদের চাষাভুষা জীবন নিতান্ত শাদাসিধে, এখানে তেমন কোনো রং-তামাশা কিংবা উত্তেজনা নেই। কিন্তু তোমাদের জীবনটাকে আরেকটু খুঁটিয়ে দেখ দেখি। তোমরা ভালো খাও, ভালো পরো, আমোদ-প্রমোদে পড়ে থাকো বটে, কিন্তু তোমাদের ভবিষৎটা কী বলতে পারো? ব্যবসা-বাণিজ্য করে তোমরা হয় খুব বড়লোক হবে নইলে পথের ফকির হয়ে ঘুরে বেড়াবে। একটা প্রবাদ আছে না—লাভ-ক্ষতি দুই ভাই। আজ যারা ধনী, পথের ভিখারি হতে তাদের কতক্ষণ? তার চেয়ে আমরা বরং বেশ আছি। চাষীদের একগাদা টাকা কোনোদিন হয় না হয়তো, কিন্তু খাওয়া-পরার ভাবনাও তাদের করতে হয় না। কেননা খাওয়ার মতো প্রচুর খাদ্য তাদের সবসময়ই থাকে।

ছোটবোনের কথা শুনে হেসে উঠল বড়বোন। সঙ্গে সঙ্গে বলল : প্রচুর খাদ্য না ছাই! কতকগুলো শুয়োর আর গরুর বাচ্চা ছাড়া তোমাদের আর আছেটা কী শুনি? না আছে ভালো পোশাক-আশাক, না আছে ভালো একটা সঙ্গীসাথী, তার আবার প্রচুর! তোমাদের চাষা স্বামীরা যতই খাটুক-না কেন, তোমরা আজ যেমন আছ মাটির ঘরে, মরবেও তেমনি সেখানেই। তোমার ছেলেমেয়েদের অবস্থাও ওরকম থাকবে।"

ছোটবোন বলল, "বেশ তো, তাতে হয়েছে কী? আমাদের খুব খাটতে হয় বটে, তবে আমাদের সে খাটনি নিজেদের জমিতেই। অন্যের কাছে আমাদের মাথা নোয়াতে হয় না। আর

তোমরা শহুরেরা—একটা বন্দি আবহাওয়ার মধ্যে তোমাদের জীবন কাটে। আজ তুমি ভালো আছ, হয়তো কালই তোমার ওপর শনির দৃষ্টি পড়ল, আর তোমার স্বামী ঘর-সংসার ভুলে জুয়া-মদে সবকিছু শিকেয় তুলল। কেমন, শহরে এসবই তো হচ্ছে অহরহ।"

ছোটবোনের স্বামী পাখম স্টোভের পাশে বসে দুইবোনের সব কথাই শুনছিল।

সে বলে উঠল, একেবার খাঁটি কথা। জমিতে ফসল ফলাতে সেই ছেলেবেলা থেকেই আমাদের মতো চাষাভুষা লোকদের এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে ওসব কুচিন্তা মগজে ঢুকবার সময় পায় না। তবে বড় একটা অভাব আমার আছে, যথেষ্ট জমি নেই আমার। যদি আরেকটু জমি পাই তাহলে স্বয়ং শয়তানকেও আমি ভয় পাই না।

চা খাওয়া শেষ করে দুবোন আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলল জামা-কাপড় নিয়ে, তারপর চায়ের কাপগুলো ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে গেল শুতে।

এদিকে হয়েছে কী, স্টোভের পেছনে শয়তান কিন্তু সারাক্ষণ ঘাপটি মেরে বসেছিল! শুনছিল সব কথা। চাষীর বৌ-এর কথায় তার স্বামী যখন গর্ব করে বলল যে একবার জমি পেলে স্বয়ং শয়তানও তা কেড়ে নিতে পারবে না, শুনে শয়তান খুশিতে নেচে উঠল।

মনে-মনে সে ভাবল : চমৎকার, এবার তোমাকে নিয়েই একটা খেলা খেলব। আগে তোমাকে অনেক জমি দেব—আর কেড়ে নেব তারপর।

দুই

এই কৃষকের বাড়ির পাশেই বাস করতেন এক মহিলা। তাঁর প্রায় দুশো চল্লিশ একর জমি ছিল। গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে বরাবরই তাঁর ভালো সম্পর্ক। কখনো কারোর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেননি। কিছুদিন হল তিনি তাঁর জমির দেখাশোনা করার জন্য একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক নিযুক্ত করেছেন। এই লোকটি নানারকম জরিমানা করে আশপাশের কৃষকদের উপর অত্যাচার শুরু করেছে। পাখম এ-ব্যাপারে দারুণ সতর্ক, তবু কখনো কোনো সময়ে তার একটা ঘোড়া হয়তো ঢুকে পড়ল মহিলার ক্ষেতে, কখনো গরুটা গেল তার বাগানে, নয়তো বাছুরটা বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকে পড়ল, তার ফসল খেয়ে এল; আর এরকম কিছু ত্রুটি ঘটলেই জরিমানা দিতে হত পাখমকে।

এক শীতকালে চারদিকে গুজব রটে গেল যে এই জমিদার-মহিলা তার সব জমি বিক্রি করে ফেলবেন। আরো শোনা গেল এই সমস্ত জমি এবং পাশের বড় রাস্তা সবই নাকি ওই মহিলার ওভারশিয়ার কিনবে। কথাটা কৃষকদের কানে গেলে তারা দুশ্চিন্তায় পড়ল। ভাবল এই লোক যদি এতবড় জমির মালিক হয়, তাহলে তাদের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যাবে, বারবার জরিমানা করে চাষীদের নাজেহাল করে ছাড়বে। অথচ ওই জমির চারপাশেই এদের বসবাস। যেমন করেই হোক জমিটা তারা হাতছাড়া করতে রাজি নয়।

কাজেই গ্রামের সমিতির পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি-দল গেল মহিলার সঙ্গে দেখা করতে। তারা বলল, আপনার জমি ওভারশিয়ারের কাছে বিক্রি না করে আমাদের কাছে করুন, আমরা আপনাকে বেশি মূল্য দেব। মহিলা এই প্রস্তাবে রাজি হলেন। তখন চাষীরা সমিতির নামে সমস্ত জমিটা কিনে নেবার চেষ্টা করল। বিরাট সভা ডাকল তারা, কিন্তু কোনো মীমাংসায় পৌছুতে পারল না। আসলে হল কী, অলক্ষে শয়তান সকলের মনে এমনই ধোঁকা দিতে লাগল যে সবাই সবার উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলল। কাজেই তারা ঠিক করল, প্রত্যেকেই আলাদাভাবে যার যতটুকু ক্ষমতা সেই অনুযায়ী জমি কিনে নেবে। আর জমিদার-

মহিলাও এ-প্রস্তাবে রাজি হলেন।

একদিন পাখম জানতে পেল, তাদের এক প্রতিবেশী পঞ্চাশ একর জমি কিনছে অর্ধেক দাম দিয়ে। বাকি অর্ধেক টাকা একবছর পরে নিতে রাজি হয়েছেন মহিলা। শুনে পাখম ঈর্ষায় ফুলতে লাগল। সে ভাবল, অন্যে যদি সব জমি কিনে ফেলে তাহলে আমি কী করব ? বউ-এর সঙ্গে সে আলোচনায় বসল—দেখ, সবাই কিছু-না কিছু জমি কিনছে। আমাদেরও একর বিশেক জমি কিনে নেয়া উচিত। দিনকালের যা অবস্থা, খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করাই একদিন অসম্ভব হয়ে উঠবে। ওভারশিয়ার তো জরিমানা হিসাবেই আমাদের সব কেড়ে নিচ্ছে। ফতুর হওয়ার আগে আমাদের কিছু জমি কিনে রাখা দরকার।

শতখানেক রুবল তাদের আগে থেকেই জমানো ছিল। এবার তারা একটা গাধার বাচ্চা আর অর্ধেক মৌমাছি বিক্রি করল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকেও চাকরিতে পাঠিয়ে ওরা কোনোরকমে জমির অর্ধেক টাকা জোগাড় করে ফেলল।

টাকাগুলো একসঙ্গে নিয়ে তিরিশ একর জমি এবং ছোট একটা বাগান পছন্দ করে পাখম মহিলার কাছে গেল জমি কিনতে। দরদস্তুর ঠিক করে মহিলার হাতে কিছু টাকা অগ্রিম দিয়ে এল সে। পরে শহরে গিয়ে একটা দলিল লিখে তাতে সই করে সব পাকাপাকি হলে পাখম অর্ধেক টাকা দিল। কথা হল, জমির বাকি অর্ধেক দাম দুবছর শেষ হবার আগেই দিয়ে দেবে।

এবার সে শ্যালকের কাছ থেকে আরো কিছু টাকা ধার করে বীজ কিনল। সময় হলে কেনা জমিতে বীজ বুনল। ফসল হল প্রচুর। কাজেই একবছরের মধ্যেই সে জমিদার-মহিলার টাকা আর শ্যালকের দেনা দুই-ই শোধ করে দিল। ব্যস ! পাখম হয়ে উঠল জমির মালিক। এখন সে নিজের জমিতে বীজ বোনে, ফসল কাটে, নিজের জমিতে ঘোড়া-গরু নিয়ে ঘাস খাওয়ায়। আজকাল চাষ করতে, ফসল তুলতে কিংবা বাগানের অবস্থা দেখতে যখনই সে ঘোড়ায় চড়ে নিজের জমিতে যায়, আনন্দে মন তার ভরে ওঠে। নিজের জমির ঘাসগুলোকে পর্যন্ত মনে হয় অন্য ঘাসের চেয়ে আলাদা ; এখানে ফুলগুলোও যেন অন্যভাবে ফোটে। কত দিনই তো পাশ দিয়ে যেতে-যেতে জমি দেখেছে সে; এই জমি, জমির মাটি আজকের মতো ভালো তার কোনোদিনই লাগেনি।

তিন

এভাবে পাখমের দিনকাল বেশ সুখেই কাটছিল। আর কাটতও চিরকাল যদি-না চারদিকের কৃষকেরা তার উপর উৎপাত শুরু না করত। মেষপালকের মেষের দল ঢুকে পড়ে তার বাগানে, রাতের বেলায় তাদের ঘোড়া ফসলের ক্ষেতে ঢুকে নষ্ট করে পাখমের সোনার ফসল। কতবার সে তাদের শান্তভাবে সাবধান হতে বলেছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। একসময় তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। পাখম জেলা-আদালতে গিয়ে নালিশ দিয়ে এল। সে জানত, ছোট চাষীরা জমির অভাবেই এ-কাজ করে, তার ক্ষতি করবার জন্য নয়। কিন্তু কতদিন আর এই অবস্থা চলতে দেয়া যায়। মাঠের ফসল খেয়ে ওরা-যে সব তছনছ করে দিল। একটা শিক্ষা অন্তত রাখালদের দেয়া উচিত।

এই ভেবে সে প্রথমে তাদের একজনের বিরুদ্ধে কোর্টে নালিশ দিয়ে এল। জরিমানা হল তার। তারপর আরো একজনের জরিমানা দিতে হল। কিন্তু ফল হল উল্টো। সবাই পাখমের উপর চটে গেল এবং প্রতিবেশীরা এবার ইচ্ছে করেই তার ফসল চুরি করতে আরম্ভ করল। একরাত্রে কে যেন বাগানে ঢুকে প্রায় দশটার মতো লিন্ডেন গাছ গোড়াসুদ্ধ উপড়ে রেখে চলে

গেল। পরদিন বাগানের পাশ দিয়ে যেতে–যেতে ব্যাপারটা দেখে কালো হয়ে গেল পাখমের মুখ। আরো কাছে গিয়ে দেখে, একটা ঝোপের সবক'টা গাছ শেকড়–সমেত উপড়ানো, একটা গাছ যদিও–বা খাড়া হয়ে আছে কিন্তু তার সব ডালপালা ছাঁটা। পাখম তো রেগে আগুন। সে মনে মনে বলল, উহ্! যদি জানতে পারতাম কে এ–কাজ করেছে একবার দেখে নিতাম তাকে।

সেই থেকে পাখম ভাবতে লাগল, লোকটা কে হতে পারে। একসময় তার মনে পড়ল সাইমনের কথা। সাইমন ছাড়া এ–কাজ কেউ করতে পারে না। তখন সে গেল সাইমনের কাছে—কিন্তু গাছের কোনও চিহ্ন তার বাড়িতে পাওয়া গেল না। বৃথাই ঝগড়া করে পাখম ফিরে এল। ঘরে এসে তার স্পষ্ট ধারণা জন্মাল যে এ–কাজ সাইমনেরই। তার বিরুদ্ধে পাখম মামলা ঠুকে দিল।

বিচার হল, কিন্তু সাইমনের বিরুদ্ধে সঠিক প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে গেল সে। ফলে আরো রেগে গেল পাখম। তার মনে হল সবাই মিলে পাখমের ওপর অবিচার করতে শুরু করেছে। ভয়ানক রেগে সে হাকিমকে বলল, 'বাবুরা, আপনাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই চোরদের যোগসাজশ আছে। নইলে কখ্খনো এভাবে সাইমনকে ছেড়ে দিতে পারতেন না।'

এভাবে হাকিম থেকে শুরু করে আশপাশের সবার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করে পাখম একা–একা নিজের জমিতে বাস করতে লাগল। আগে সবাই তাকে ভালোবাসত। এখন সে অনেক জমির মালিক। তবু মানুষ আগের মতো তাকে আর ভালোবাসে না।

সেইসময় চারদিকে শোনা গেল, অনেক চাষী রাশিয়ার এই অঞ্চল ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে। পাখম ভাবল, জমি ফেলে আমার কোথাও যাবার দরকার নই। যদি অন্যেরা যায়, ভালোই তো, আমার আরো জমি হবে। তাদের জমিগুলো আমি কিনে নিতে পারব। তখন চারদিকে সবই হবে আমার জমি। আমি আরো আরামে থাকতে পারব। এতটুকু জমির মধ্যে বড় আঁটাআঁটিতে বাস করতে হচ্ছে আমাকে।

বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা। পাখম তখন বাড়িতে, এমন সময় একজন পথিক–কৃষক এসে হাজির হল। কৃষকটির বাড়ি অন্য গ্রামে। পাখম তাকে রাতের জন্য আশ্রয় দিল, খেতেও দিল। রাত্রে তার সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল। পাখম জিজ্ঞেস করল, সে কোত্থেকে এসেছে? জবাবে লোকটি বলল, 'আমি এসেছি ভলগা নদীর ওপার থেকে। সেখানে আমি কাজ করি।'

লোকটা আবার বলল, 'সেখানে নতুন একটি বসতি গড়ে উঠছে। যে–কেউ গিয়ে সমিতিতে নাম লেখালেই তাকে ওরা বিশ একর করে জমি দিচ্ছে। আর সে–জমিও এত ভালো যে ফসল বুনতে–না–বুনতেই তা ঘোড়ার মতো বড় হয়ে ওঠে। একবার এক গরিব চাষী সেখানে গেল, সে এত গরিব যে খেটে খাবার দু–খান হাত ছাড়া তার আর কোনো সম্বল ছিল না। অথচ এবার সে একশো একর জমিতে শুধু গমই ফলিয়েছে। গত একবছরে একমাত্র গম বেচেই লোকটি পাঁচহাজার রুবল পেয়েছে!'

শুনে পাখমের মন উতলা হয়ে উঠল। ভাবল, এমন আয়–রোজগার যদি সেখানে করতে পারি, তাহলে এখানে এমন গরিবের মতো কুঁকড়ে পড়ে থাকি কেন? জমি–বাড়ি সব বিক্রি করে আমিও সেই দেশে যাব। সেখানে নতুন বাড়ি বানাব, আর চাষের জমি করব অনেক। এখানে তো দুঃখকষ্ট লেগেই আছে। অবশ্য জায়গা–জমি বেচার আগে সেই জায়গাটা দেখে আসতে হবে আমাকে।

একটু–একটু গরম পড়তেই পাখম সেই নতুন দেশ দেখতে বেরিয়ে পড়ল। প্রথমে জাহাজে

চড়ে ভলগা নদী দিয়ে সে পৌছুল সামারা অঞ্চলে। তারপর সেখান থেকে তিনশো মাইল পথ পায়ে হেঁটে পাখম পৌছুল সেই নতুন দেশে।

লোকটি যা বলেছিল তার সবই সত্যি। সমিতি প্রত্যেককে বিশ একর করে জমি বিলি করছে। সে-জমিও অতি চমৎকার। সমিতি তাকে আরো খবর দিল যে বিশ একর জমি ছাড়াও কেউ ইচ্ছা করলে অল্পদামে যত খুশি জমি কিনতে পারে। জমির দাম একরপ্রতি মাত্র তিন রুবল।

সবকিছু জেনে পাখম বাড়ি ফিরে এল হেমন্তকালে। এসেই সব বিক্রি শুরু করল। জমি, বাড়ি, ফসল সবই পাখম ভালো দামে বেচতে পারল। তারপর বসন্তকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে একদিন সবাইকে নিয়ে নতুন দেশে রওনা হয়ে গেল।

চার

নতুন গ্রামে পৌছুলে সঙ্গে সঙ্গে পাখমকে সেই গ্রামের সমিতির একজন সভ্য করে নেয়া হল। মাথাপিছু হিসেবে প্রায় একশ' একর জমি দেয়া হল তাকে। এ ছাড়া গরু-ঘোড়ার খাওয়াবার জন্য আলাদা ঘাসের জমিও পেল কিছু। মনের খুশিতে নতুন ঘরবাড়ি তৈরি করে ফেলল পাখম। কেননা আগে যা ছিল তার চেয়ে দশগুণ বেশি ধনী সে এখন। চাষের জন্য কিংবা গরু-ঘোড়া চরাবার জন্য জমির কোনো অভাব নেই। যত ইচ্ছে গরু-ঘোড়া এখন পুষতে পারে সে।

প্রথম-প্রথম পাখমের কাছে সবকিছুই মনে হয়েছিল চমৎকার। পাকা বাড়ি, তকতকে ঝকঝকে ঘর, প্রচুর জমি, ভালো ভালো ঘোড়া আর গরু। কিন্তু একটু পা ছড়িয়ে বসবার পরে তার আবার মনে হতে লাগল যে জায়গা বড় কম।

গম চাষের সাধ জাগলেও গম চাষের মতো প্রচুর জমি তার নেই। গম জন্মায় ঘাসজমি, নতুন জমি কিংবা একবার চাষের পর বছর দু-এক ফেলে-রাখা জমিতে।

প্রথম বছর পাখম তার জমিতে গম বুনে চমৎকার ফসল পেল। পরের বছরও সে গম বুনতে চাইল। কিন্তু তার এত জমি ছিল না যে গতবছরের ফসলের জমি দুবছর ফেলে রেখে নতুন জমিতে ফসল বুনবে। কাজেই আরো জমি লিজ নিয়ে গম বুনল। গম হল প্রচুর কিন্তু সে জমি বাড়ি থেকে এত দূরে যে ফসল বয়ে আনতে অনেক কষ্ট হল তার।

এরপরও সে নতুন-নতুন জমি লিজ নিয়ে তাতে গম বুনে পাঁচবছর কাটিয়ে দিল। ভাগ্য তার খুব ভালো। প্রত্যেকবার সে প্রচুর ফসল পেল। অনেক অর্থ জমল পাখমের। একবার সে কয়েকজন চাষীকে নিয়ে এক মহাজনের বিশাল জমিতে গম চাষ করল। এদিকে সেই জমি নিয়ে এক মামলায় হেরে গেল মহাজন। ফলে সমস্ত খাটুনিটাই বরবাদ হয়ে গেল। জমিটা নিজের হলে পাখমের এই ক্ষতিটা হত না। সেই থেকে পাখম আরো জমি কেনার ধান্দা করতে লাগল। এক কৃষকের সঙ্গে একহাজার একর জমির দামদরও প্রায় ঠিক হয়ে এল। এমন সময় এক বিদেশি তার ঘোড়াগুলোকে একটু বিশ্রাম দেবার আশায় এসে উঠল পাখমের বাড়িতে। চা পান করতে করতে বিদেশি লোকটি বলল, 'অনেক অনেক দূরের বাসকিরদের দেশ থেকে আমি এসেছি। বাসকির হল বেদের জাত—একজায়গায় বেশিদিন থাকে না। সেখানে আমি একহাজার রুবল দিয়ে দশহাজার একর জমি কিনেছি।'

কৌতূহলী হয়ে পাখম তাকে অনেক কিছুই জিজ্ঞেস করল। লোকটি বলল, তোমাকে শুধু ওদের সর্দারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। তা হলেই তোমাকে আর পায় কে। আমি তো কিছু কাপড়-চোপড়, কার্পেট আর একবাক্স চা মিলিয়ে শতখানেক রুবল উড়িয়েছি, কিছু ভদ্‌কা

খাইয়েছি। তাতেই ওরা খুশি হয়ে একরপ্রতি জমি মাত্র আটপয়সায় কোপেকে দিয়ে দিয়েছে।

বিদেশি লোকটি তার দলিলপত্র দেখিয়ে আবার বলল, 'জমিগুলো সব নদীর ধারে। চারদিক খোলা। এর আগে কেউ কোনোদিন সে জমিতে চাষ করেনি। আর তাছাড়া সেখানকার মানুষগুলো একেবারে ভেড়ার মতো সরল। আপনি অনায়াসে যে-কোনো জিনিশ তাদের কাছে থেকে বাগিয়ে নিতে পারবেন।'

পাখম ভাবল, সেখানে গিয়ে আমি যদি সহজেই জমিদার হয়ে উঠতে পারি, তাহলে এখানে জমি কিনব কেন?

পাঁচ

বিদেশি লোকটির কাছ থেকে পথঘাট জেনে নিয়ে পাখম যাবার জন্য তৈরি হল। স্ত্রী-পুত্র সব রেখে গেল জমি-জমা, ঘর-বাড়ি দেখাশোনা করতে। সঙ্গে একজন চাকর নিয়ে পাখম হাজির হল এক শহরে। এখান থেকে একবাক্স চা, কিছু মদ আর বেশকিছু টুকিটাকি জিনিশ কিনল বাসকির সর্দারদের উপহার দেবার জন্য।

সেখান থেকে আবার ওরা যাত্রা শুরু করল, প্রায় তিনশ মাইলের বেশি পথ পার হয়ে সাতদিনের দিন সে বাসকিরদের তাঁবুতে গিয়ে হাজির হল।

এদের সম্পর্কে যা-কিছু সে কানে শুনেছিল তার সবই ঠিক। খোলা প্রান্তরের ভেতর দিয়ে যে-নদীটা বয়ে চলেছে, তারই ধারে-ধারে চামড়ার ছাউনি দেয়া তাঁবুতে ওরা বাস করে। জমি তারা চাষ করে না, কোনো ফসলও খায় না। খোলা মাঠে চরে বেড়াচ্ছে গরু-মহিষ আর কোসাক ঘোড়ার দল। ঘোড়ার বাচ্চাগুলো বেঁধে রেখেছে তাঁবুর পেছনে। দিনে দুবার করে মা-ঘোড়াকে তাড়িয়ে আনা হয় বাচ্চাদের দুধ খাওয়াতে। বাসকিরদেরও প্রধান খাদ্য এই ঘোড়ার দুধ। লোকগুলো ঘোড়ার দুধ দিয়ে কুমিস নামে একরকমের পানীয় তৈরি করে। কুমিস থেকে আবার তৈরি হয় পনির। তারা কুমিস আর চা পান করে, ভেড়ার মাংস খায় আর মনের আনন্দে বাঁশি বাজায়। লোকগুলোর স্বাস্থ্য খুব ভালো, সবসময় হাসি-তামাশায় মশগুল, বছরের অর্ধেকটা সময় তারা শুয়ে-বসেই কাটায়। লেখাপড়া কেউ জানে বলে মনে হয় না, রুশভাষা তো একজনও বোঝে না। তবে মানুষ হিসেবে তারা খুবই সরল। অন্তরগুলো দয়ায় ভরা।

পাখমকে দেখেই তারা দলে দলে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে তার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াল। একজন দোভাষী এল পাখমের কথাবার্তা বুঝিয়ে দিতে। ওরা বুঝতে পারল পাখম এসেছে কিছু জমি কেনা যায় কি না তাই দেখতে। এ-কথা শুনে লোকগুলো ভারি খুশি হয়ে পাখমকে বুকে জড়িয়ে ধরল। পাখমকে তারা সবচেয়ে বড় তাঁবুর ভেতরে নিয়ে গেল। সবচেয়ে ভালো জায়গায় তাকে বসিয়ে নিজেরা বসল তার চারদিক ঘিরে। চা এল, কুমিস এল, একটা ভেড়াও জবাই হল পাখমের জন্য। পাখম তার উপহারের জিনিশগুলো বের করে সবার মধ্যে বিলিয়ে দিল। বাসকিরদের সে কী আনন্দ। নিজেদের ভেতর কী যেন বলাবলি করে তারা দোভাষীকে ডাকল।

দোভাষী তখন পাখমকে বুঝিয়ে বলল, এরা বলছে যে তুমি এসেছ বলে বাসকিররা খুব খুশি হয়েছে। এদের রীতি হল কোনো উপহার পেলে তার বিনিময়ে যে-কোনো উপায়ে অতিথির আশা পূরণ করা। তুমি অনেককিছু এনে এদের উপহার দিয়েছ। এখন এরা জানতে চাইছে, তুমি এদের কোন্ জিনিশ সবচেয়ে বেশি পছন্দ করো। তুমি যা চাইবে তাই তোমাকে

দেয়া হবে।

পাখম বলল, 'এখানে এসে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে তোমাদের জমি। যেখান থেকে আমি এসেছি, সেখানে জমির বড় অভাব। আর যাও–বা আছে, তাতে ভালো ফসল ফলে না। তোমাদের জমির তুলনা মেলা ভার। এত ভালো জমি এর আগে কখনো দেখিনি আমি।'

দোভাষী তার কথাগুলো বাসকিরদের বুঝিয়ে দিল। বাসকিররা আবার কিছুক্ষণ আলোচনা করল নিজেদের ভেতর। পাখম তাদের কথাবার্তার কিছুই বুঝতে পারছিল না। অবশ্য তাদের হো–হো করা তুমুল হাসি দেখে বোঝা যাচ্ছিল পাখমের ওপর তারা সন্তুষ্ট।

বেশ কিছুক্ষণ পর তাদের আলোচনা থামলে দোভাষী পাখমকে বলল, 'তোমার সদয় ব্যবহার আর সুন্দর উপহারের পরিবর্তে এরা তোমাকে জমি দিতে রাজি হয়েছে। তোমার যত জমি দরকার ততটুকুই পাবে।'

এই সময় লোকগুলো আবার যেন কী নিয়ে তর্কাতর্কি শুরু করে দিল। পাখম দোভাষীকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, 'এদের কেউ কেউ বলছে, তোমাকে জমি দেবার আগে একবার সর্দারকে বলে নেয়া উচিত। তাকে না–জানিয়ে কিছু করা ঠিক হবে না। অন্যেরা বলছে সর্দারকে জানাবার কোনো দরকার নেই।'

ছয়

ওদের তর্কাতর্কির মাঝে শেয়ালের চামড়ার লম্বা টুপি–পরা একটা লোক সামনে এসে দাঁড়াল। দোভাষী পাখমকে বলল, 'ইনিই হচ্ছেন আমাদের সর্দার।'

সঙ্গে সঙ্গে পাখম সবচেয়ে সুন্দর একটা জামা আর সের–পাঁচেক ভালো চা সর্দারকে উপহার দিল। সর্দার হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলেন সেসব। তারপর তিনি তার আসনে বসলে বাসকিররা সমস্ত ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে বলল। তাদের কথা শুনে সর্দার হাতের ইশারায় সবাইকে বসতে বললেন। হাসিমুখে তিনি রুশভাষায় পাখমকে বললেন, 'বেশ, তুমি যা চাও তাই হবে। কোন্ জমিটা তোমার পছন্দ আমাদের দেখিয়ে দাও। আমাদের জমির কোনো অভাব নেই।'

পাখম মনে মনে ভাবতে লাগল, যতটা সম্ভব জমি আদায় করে নিতে হবে। আর লেখাপড়া করে পাকাপাকিভাবে নেয়া উচিত। তা না হলে আজ দিচ্ছে, কাল যদি আবার কেড়ে নেয়।

এরকম ভাবনার পর সে সর্দারকে বলল, 'আপনার দয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের জমির কোনো অভাব নেই, তার মাঝ থেকে সামান্য একটুমাত্র চাইছি। কোন্ জমিটুকু আমার হবে সে–বিষয়ে আমি নিশ্চিত হতে চাই। জমি মেপে আমাকে লেখাপড়া করে দেয়া যাবে কি হুজুর? মানুষের মরা–বাঁচা ঈশ্বরের হাতে। আপনারা দয়ালু বলেই আমাকে এ জমি দিতে রাজি হয়েছেন, কিন্তু দুদিন পরে আপনাদের ছেলেমেয়েরা আবার সেটা কেড়েও তো নিতে পারে।'

সর্দার সরল মানুষ। তিনি বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ। লেখাপড়া করেই তোমাকে দেব।'

পাখম এবার সেই বিদেশি লোকটির কথা তুলে বলল, তাকেও তো আপনারা শহুরে পাকা দলিল করে জমি দিয়েছেন। দয়া করে আমার বেলায়ও সেরকম করুন।

এবার সর্দার পাখমের মনের কথাটি ধরতে পারলেন। বললেন, 'ঠিক আছে। আমাদের

এখানে একজন মুন্সি থাকেন। সেই শহরে গিয়ে তোমার দলিলের ব্যবস্থা করে দেবে।'

'আমাদের এখানে জমির দাম দিন-প্রতি একহাজার রুবল মাত্র।' 'দিন-প্রতি' কথাটা পাখম বুঝতে পারল না। তাই সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'দিন-প্রতি' এটা আবার কেমন মাপ? একদিনে কত একর জমি হবে?'

'জমির মাপজোখ আমরা বাপু তেমন জানি না। তাই দিনের হিসেবে আমরা জমি বিক্রি করি। অর্থাৎ একদিনের মধ্যে তুমি যতটা জমি ঘুরে আসতে পারবে তার সবটাই তোমার। এই হচ্ছে আমাদের জমির মাপ, আর তার দাম হল একহাজার রুবল।'

পাখম অবাক হয়ে বলল, 'বলেন কী! একদিনে তো গোটা একটা জেলা ঘুরে আসা যায়!'

সর্দার হেসে ফেললেন। বললেন, 'তাহলে একটা জেলার সমান জমিই তোমার হবে। তবে হ্যাঁ, একটা শর্ত আছে। যেখান থেকে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তুমি রওনা হবে, সূর্য ডুবে যাওয়ার আগে যদি ঠিক সেখানে ফিরে আসতে না পারো তবে তোমার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।'

পাখম আবার জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, কতটা আমি গিয়েছি তার চিহ্ন রাখব কেমন করে?'

'কেন, আমরা তোমার সঙ্গেই থাকব। পছন্দমতো তুমি যেখান থেকে যাত্রা শুরু করবে—আমরা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকব আর তুমি হাঁটা শুরু করলে আমার কয়েকটি যুবক ঘোড়ায় চড়ে তোমার পিছে পিছে যাবে। তুমি যেখানে যেখানে বলবে সেখানেই তারা একটি করে খুঁটি পুঁতবে। তারপর সেই খুঁটি বরাবর লাঙল চালিয়ে দাগ দেয়া হবে। শুধু সূর্যাস্তের আগেই তোমাকে যাত্রা শুরুর জায়গায় ফিরে আসতে হবে। যতটা জমি তুমি ঘুরে আসতে পারবে সবটাই হবে তোমার।'

মনের খুশিতে পাখম যেন ফেটে পড়ছিল। ঠিক হল, আগামীকাল খুব ভোরে পাখম যাত্রা শুরু করবে।

আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে তারা সকলে মিলে পান করল কুমিস, গরম ভেড়ার মাংস আর ধোঁয়া-ওঠা চা। খাওয়াদাওয়ার উৎসব শেষে পাখম শুতে গেল। আহ্! কী সুন্দর নরম পাখির পালকের উষ্ণ বিছানা!

অন্যেরাও শোবার জন্য চলে গেল। কথা হল, আগামীকাল সূর্যাস্তের আগেই নদীর ধারের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সবাই এসে জমায়েত হবে।

সাত

সারারাত পাখমের চোখে ঘুম এল না। সারারাত কেটে গেল কেবল জমির স্বপ্ন দেখে, নতুন জমির ভাবনা ভেবে।

শুয়ে-শুয়েই ও ভাবতে লাগল, খুব বড় একটা চক্কর দিয়ে ফিরে আসতে হবে। সারাদিনে অন্তত পঁয়ত্রিশ মাইল হেঁটে আসতে পারব। আর পঁয়ত্রিশ মাইলের মধ্যে জমির পরিমাণ বিশ হাজার একরের কম হবে না। তখন আর আমাকে পায় কে! এর ভেতর যে-জমি একটু খারাপ হবে সে-জমি বিক্রি করে ফেলব, ভালো জমিগুলো অবশ্য নিজেই চাষ করব আমি। এত জমি চাষের জন্য দুটো বলদ কিনতে হবে। আর রাখতে হবে গোটাদুয়েক চাকর। কিছু জমি ফেলে রাখতে হবে ঘাস জন্মাবার জন্য—গরু-ঘোড়াও তো পালতে হবে!

সারারাত পাখম দুচোখের পাতা এক করতে পারল না। ভোরের দিকে একটু তন্দ্রামতো এল। সঙ্গে সঙ্গে সে স্বপ্ন দেখল একটা। সে যেন একটা তাঁবুতে শুয়ে-শুয়ে শুনতে পাচ্ছে

বাইরে কে একজন বেদম হাসছে আর কথা বলছে। কে এমন করে হাসছে দেখবার জন্য সে তাঁবুর বাইরে এসে দেখল, মাটির ওপর বসে আছেন সর্দার। বুকের দুপাশ চেপে ধরে সর্দার এমন করে হাসছেন যেন তার পেট ফেটে যাবে। স্বপ্নের মধ্যেই পাখম হেঁটে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এত হাসছেন কেন?' কিন্তু ভালো করে চেয়ে দেখতেই পাখম বুঝতে পারল, লোকটি সর্দার নয়। এ তো সেই বিদেশি লোক যে তাকে পরামর্শ দিয়ে এখানে এনেছে। পাখম তাকে জিজ্ঞেস করতে যাবে, 'কিছুদিন আগে আপনি আমার বাড়িতে গিয়েছিলেন না?' ঠিক তখনি লোকটির চেহারা আবার বদল হয়ে গেল। পাখম দেখল এ যেন সেই প্রথম লোক যে ভলগা নদীর ওপার থেকে তার কাছে গিয়েছিল। পাখম আবার জিজ্ঞেস করতে গেল, 'কীভাবে সে এখানে এল?' কিন্তু লোকটির চেহারা আবার বদলে গেল, পাখম দেখল, এ লোকটি মানুষ নয়, এ হচ্ছে স্বয়ং শয়তান। মাথায় তার শিং আর পায়ে জন্তুর মতো খুর। মাটিতে বসে হাসতে হাসতে কিসের দিকে যেন সে একভাবে তাকিয়ে আছে—আর হাসছে। স্বপ্নের ভেতরেই পাখম কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল, একটা লোক। তার পা খালি। পরনে পায়জামা, গায়ে শুধু একটা শার্ট—চিৎ হয়ে মরে পড়ে আছে। তার মুখ কাগজের মতো শাদা। মরা লোকটিকে ভালো করে দেখতে পাখম এগিয়ে গেল। দেখল মৃতলোকটি আর কেউ নয়—সে নিজেই। স্বপ্নে এইসব দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পাখম জেগে উঠল। তার মনে হল, কী আজব স্বপ্নই না মানুষ ঘুমের ঘোরে দেখে। জানালা দিয়ে পুবের দিকে চাইতে সে দেখল ভোরের প্রথম আলো ঘরে উঁকি দিচ্ছে।

না, আর কুঁড়েমি করা চলে না, যাত্রা শুরু করতে হবে এখনি। বলেই সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। চাকরকে ডেকে জাগাল এবং গাড়িতে ঘোড়া জুড়তে বলে বাসকিরদের কাছে রওনা হয়ে গেল।

বাসকিররাও ঘুম থেকে উঠে একে-একে তৈরি হয়ে নিল। সর্দার এসে হাজির হলেন। সবাই তারা কুমিস দিয়ে সকালের খাবার খেল। তারা পাখমকেও চা খেতে বলল। কিন্তু তার হাতে আর সময় নেই। বলল, 'যদি আমাদের যেতে হয় তো এখনি চলুন। সময় হয়ে গেছে।'

আট

আজ পাখমের স্বপ্ন সফল হওয়ার দিন। সকলের সঙ্গে সে যাত্রা শুরু করল। কেউ গেল ঘোড়ায় চড়ে, কেউ গেল গাড়িতে। খোলা প্রান্তরের মাঝে একটা ছোট পাহাড়ের দিকে সবাই এগিয়ে চলল। এখানে সবাই এসে পৌছালে সর্দার পাখমের কাছে এসে চারদিকে হাত ঘুরিয়ে বলল, 'এই যে, তোমার সামনে যতদূর দেখতে পাচ্ছ সবটা আমাদের জমি। এই জমির যে-কোনো অংশ তুমি পছন্দ করে নিতে পারো।' পাখমের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। সামনে অফুরন্ত জমি। সমস্ত জমি বুকসমান ঘাসে ভর্তি, আর হাতের তালুর মতো সমতল। এই জমি কেউ কোনোদিন চাষ করেনি। উহ্, কী চমৎকার জমি!

সর্দার তার মাথার টুপিখানা খুলে পাহাড়ের ঠিক মাঝখানে রেখে বললেন, 'এই হল তোমার চিহ্ন। এখানে থেকে তুমি যাত্রা শুরু করবে আবার এখানেই ফিরে আসবে। যতটা জমি ঘুরে আসতে পারবে সবটাই তোমার।'

পাখম নোটগুলো বের করে টুপিটার মধ্যে রাখল। গায়ের কোটটা খুলে কোমরের বেল্ট শক্ত করে বেঁধে নিল। রুটি-ভরা একটা ঝোলা রাখল জামার নিচে আর বেল্টের সঙ্গে বাঁধল একটা পানির বোতল। তারপর জুতোর ফিতে বেঁধে নিল ভালো করে। এসব হয়ে গেলে সে

রওনা দেবার আগে দাঁড়িয়ে ভাবল, 'কোন্ দিকে যাব? সবদিকে ভালো জমি!' আপন মনে আবার বলে উঠল 'যেদিকেই যাই না কেন—কিছু যায় আসে না। বরং আমি হাঁটব সূর্যোদয়ের দিকে।' কাজেই সে পূর্বদিকে চেয়ে সূর্য ওঠার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

মনে মনে ভাবল, এতটুকু সময় আমি নষ্ট করব না। বাতাস ঠাণ্ডা থাকতেই আমাকে সবচেয়ে বেশি পথ হেঁটে নিতে হবে।

তখন সর্দারের লোকেরা ঘোড়ার পিঠে বসে পাখমের সামনে এসে দাঁড়াল। পুব আকাশে সূর্য যেই উঁকি দিয়েছে অমনি পাখম এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

প্রথমে সে খুব স্বাভাবিকভাবে চলতে লাগল। প্রায় হাজারখানেক গজ গিয়ে থামল সে। একটা খুঁটি পোঁতা হল। তারপর আবার চলতে লাগল। আস্তে-আস্তে লম্বা পা ফেলে সে হাঁটার গতি দিল বাড়িয়ে। কিছুক্ষণ পর থেমে আরেকটি খুঁটি পোঁতা হল।

পাখম এবার পেছনের দিকে তাকাল। পাহাড়ের উপর লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। সূর্যের আলোতে তাদের সবাইকে দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। পাখম অনুমান করল, মাইল-তিনেক পথ সে ছাড়িয়ে এসেছে। একটু একটু গরম লাগছে তার। গায়ের জামাটা খুলে সে বেল্টের সঙ্গে বেঁধে নিল। আরো মাইল-তিনেক হাঁটার পর থামল সে। এখন সূর্যের তেজটা বেশ গায়ে লাগছে। আকাশের দিকে তাকাল আবার। নাস্তা খাওয়ার কথা মনে পড়েছে। মনে মনে হিশেব করে দেখল, এতক্ষণে দিনের মাত্র চারভাগের একভাগ সময় ব্যয় হয়েছে। এখনই মোড় ফেরাবার দরকার নেই। পায়ের জুতোজোড়া খুলে নিলে বোধহয় হাঁটতে সুবিধে হবে। এই ভেবে সে জুতো খুলে বেল্টের সঙ্গে বেঁধে আবার হাঁটতে শুরু করল। ভাবল, আরো মাইল-তিনেক পার হয়ে তারপর বাঁ-দিকে মোড় ফিরব। এই জমিটা খুবই ভালো মনে হচ্ছে। এরকম জমি ছেড়ে যাওয়া বোকামি হবে। কাজেই আরো কিছুক্ষণ এগিয়ে গিয়ে পাখম পেছনে ফিরে তাকাল। দেখল সেই পাহাড়টা প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। উপরের লোকগুলোকে দেখাচ্ছে ছোট ছোট পিঁপড়ের মতো।

এবার পাখমের মনে ফেরার চিন্তা এল। মনে হল বেড়টা বেশ বড়ই হয়েছে—আর নয়। এবার ফিরতে হবে। ঘাম ঝরছে শরীরে। তেষ্টাও পেয়েছে খুব।

সেখানে আরেকটা খুঁটি পোঁতা হল। বোতল থেকে তৃপ্তিমতো পানি খেয়ে বাঁ-দিকে মোড় ঘুরে চলতে লাগল। এখানে মানুষ-সমান উঁচু ঘাস, আর সূর্যের তেজও প্রবল। আস্তে-আস্তে পাখমের ক্লান্তি বোধ হতে লাগল। আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝল, দুপুর হয়ে গেছে। এখন একটু বিশ্রাম নিতে হবে।

কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পাখম খানিকটা রুটি খেল এখানে, সঙ্গে সঙ্গে পানি খেয়ে শুকনো মুখটা ভিজিয়ে নিল। পাখম বসল না। তার ভাবনা হল, একবার বসলেই শুতে ইচ্ছে করবে, আর এই ক্লান্ত শরীরে একটু শুলেই সে ঘুমিয়ে পড়বে। কাজেই ওভাবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খানিক বিশ্রামের পর পাখম আবার চলতে শুরু করল। প্রথমদিকে তার হাঁটতে তেমন অসুবিধা হল না, খাবার খেয়ে সে শরীরে কিছুটা হলেও জোর ফিরে পেয়েছিল। অথচ ওদিকে সূর্য আরো প্রখর হয়ে উঠেছে, একটু হেলেও গেছে পশ্চিমের দিকে। গরমে তার শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে, যেন দেহটা এবার অবশ হয়ে যাবে। কিন্তু থামলে চলবে না। এখন একটা ঘণ্টা কষ্ট করলে বাকি জীবনটা সুখ আর ঐশ্বর্যে ভরে উঠবে।

হাঁটার পথটাকে গোলাকার রেখে মাইল-ছয়েক হাঁটার পর বাঁ-দিকে বাঁক নেবে, গন্তব্যের কাছাকাছি চলে যাবে—ঠিক এমনি সময় পাখমের চোখে পড়ল একটু ভেজা-ভেজা সুন্দর

একটুকরো জমি। এটুকু ছেড়ে গেলে সারাজীবন দুঃখ রয়ে যাবে। নাহ্, কখ্খনো এ-জমি ছেড়ে যাওয়া যায় না ! কাজেই বেশ অনেকটা পথ হেঁটে সে পুরো জলা জায়গাটা ঘুরে এল। একটা খুঁটি পুঁতে পাহাড়ের দিকে তাকাল ; লোকগুলো একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে, ওই পথ সাত-আট মাইলের কম হবে না।

পাখমের মনে হল ; জমির পাশগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে। এখন কোণা বরাবর হেঁটে পথ সংক্ষিপ্ত করতে হবে। কাজেই এবার সে খুব তাড়াতাড়ি পা ফেলতে লাগল। সূর্য অনেকখানি হেলে পড়েছে। এদিকে চারকোণা জমির তৃতীয় লাইনের অর্ধেকও সে ছাড়াতে পারেনি। পাহাড় এখনো দশমাইলের কম হবে না।

নাহ্, জমিটার আকার যদিও তেকোণার মতো হয়ে যাচ্ছে, তবুও এভাবেই হাঁটতে হবে। আমার অনেক জমি হয়ে গেছে। পথে আশপাশের নতুন জমি নেবার আর কোনো চেষ্টা করব না। তাড়াতাড়ি একটা গর্ত করে পাখম সোজা এগিয়ে চলল পাহাড়ের দিকে।

নয়

কোনোদিকে না-তাকিয়ে পাখম সোজা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে—কিন্তু হাঁটতে বড় কষ্ট পাচ্ছে সে। একে তো ভীষণ গরম, তারপর খালিপায়ে হাঁটতে গিয়ে নানা জিনিশের সঙ্গে হোঁচট খেতে-খেতে কেটে-ছিড়ে খুবই যন্ত্রণা করছে। পা দুটো যেন আর দেহের ভার বইতে পারছে না। একটু বিশ্রাম করতে দারুণ ইচ্ছে তার অথচ সামান্য বিশ্রাম নিলেও পাখম সূর্য-ডোবার আগে পাহাড়ে পৌছাতে পারবে না। সূর্য কারো মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। ডুববার সময় হলে সে ডুবতেই থাকে।

পাখমের মনে হতে লাগল, কে যেন গাড়ির চালকের মতো তাকে চাবুক মেরে-মেরে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। টলতে টলতে সে এগুতে লাগল।

মনে তার ভাবনা এল, তবে কি হিশেবে আমার কোনও ভুল হয়ে গেছে ! এখনো কত পথ পড়ে রয়েছে, অথচ শরীর মরে যাচ্ছে। তবে কি আমার সব অর্থ, পরিশ্রম, আকাঙ্ক্ষা বৃথা হবে? হায় ঈশ্বর ! বেশি করে জমি নিতে চেয়ে কী ভুলই না করেছি আমি। এখন পাহাড়ে পৌছতে দেরি হলে আমার কী উপায় হবে?

পাখম একবার তাকায় সূর্যের দিকে, একবার পাহাড়ের দিকে। এখনো অনেক দূরে পড়ে আছে সে। মনে একটু জোর তৈরি করে সে দৌড়াতে শুরু করল। পা ছিড়ে রক্ত ঝরছে তবু সে দৌড়াচ্ছে, দৌড়াচ্ছে, প্রাণপণ শক্তিতে সে দৌড়াচ্ছে। গায়ের কোট জামা জুতো খুলে সে ছুড়ে ফেলে দিল। ফেলে দিল পানির বোতল এবং মাথার টুপি। 'হায়, সবকিছু দেখে আমি কত খুশিই না হয়েছিলাম। এখন বেশি পেতে চেয়ে সবই যে হারালাম ! সূর্যাস্তের আগে কিছুতেই আমি পৌছাতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। হায়, হায় আমার কী উপায় হবে?'

দারুণরকম ভয় পাওয়ার ফলে তার দমও ফুরিয়ে গেল। তবু হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়াল পাখম। তার জামা-পাজামা ঘামে ভিজে শরীরের সঙ্গে সেঁটে গেছে। মুখের ভেতরটা গেছে শুকিয়ে। কে যেন বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটাচ্ছে। পা দুটো আর একেবারেই দেহের ভার সইছে না, মনে হচ্ছে ও-দুটো তার নিজের পা নয়। মনে হচ্ছে, মৃত্যু যেন ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু মৃত্যু ঘনিয়ে এলেও তো পাখমের উপায় নেই। এতদূর এসে থামলে সবাই তাকে বোকা বলবে !

অতএব দৌড়ানো দরকার। পাখম দৌড়াচ্ছে। দৌড়াতে দৌড়াতে পাখম হঠাৎ বাসকিরদের

চিৎকার শুনতে পেল। ওদের চিৎকার শুনে পাখমের শরীর উত্তেজিত হয়ে উঠল। শেষ শক্তিটুকু একত্র করে সে দৌড়াতে থাকে সামনে—আরো সামনে!

সূর্য তখন অনেক নেমে গেছে। আর তার রং হয়েছে টকটকে লাল।

সূর্য যেমন ডুববে-ডুববে করছে—পাহাড়টাও তেমনি অনেক কাছে এসে গেছে। দেখতে পেল পাখম—পাহাড়ের উপর থেকে লোকজন হাত নেড়ে-নেড়ে তাকে ডাকছে। তাকে অভ্যর্থনা দেয়ার জন্য সবাই উত্তেজিতভাবে আনন্দ প্রকাশ করছে। মাটিতে দেখতে পেল সেই টুপি। টুপির পাশেই সর্দার বসে আছেন। হঠাৎ পাখমের মনে পড়ে গেল সেই স্বপ্নের কথা।

পাখম ভাবল, অন্তত এখন আর আমার জমির অভাব নেই। কিন্তু ঈশ্বর কি আমাকে জমি ভোগ করার সুযোগ দেবেন? আমি-যে আর একটুও পারছি না।

পাখম শেষবারের মতো তাকাল সূর্যের দিকে। প্রকাণ্ড বড় সূর্যটা মাটি স্পর্শ করেছে বলে মনে হল। সুর্যের নিচের দিকে অনেকখানি ডুবে গেছে এরি মধ্যে। সে সামনের দিকে ঝুঁকে ছুটতে লাগল। পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছাতেই সব যেন আঁধার হয়ে গেল। সূর্য ডুবে গেছে! পাখম এবার চিৎকার করে উঠল, আহ্ আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

গভীর হতাশায় সে থামতে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে পড়ল, নিচ থেকে যদিও তার মনে হচ্ছে সূর্য ডুবে গেছে কিন্তু পাহাড়ের উঁচুতে যারা রয়েছে তাদের কাছে সূর্য হয়তো এখনো অস্ত যায়নি। সে জোরে-জোরে নিশ্বাস নিয়ে পাহাড়টাকে আঁকড়ে ধরে উপরে উঠতেই পাখম দেখতে পেল টুপিটাকে। সর্দার বসে আছেন টুপির সামনে। তিনি কোমরে দুহাত রেখে তেমনি হাসছেন। দেখেই আবার সেই স্বপ্নের কথা পাখমের মনে পড়ল। চিৎকার করে উঠল পাখম। পাদুটো তার একেবারে অবশ হয়ে গেছে। হঠাৎ সে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। পড়তে পড়তেও একবার দুহাত বাড়িয়ে দিল টুপিটার দিকে—টুপিটা সে ছুঁতে পেরেছে!

তখনি সর্দার চিৎকার করে উঠলেন, 'শাবাশ বেটা, অনেক জমি তুমি পেয়েছ!' পাখমের চাকর-ছেলেটা দৌড়ে এল। মনিবকে তুলতে চেষ্টা করল। পাখমকে কিছুতেই ওঠানো গেল না। সে দেখল পাখমের মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরে পড়ছে। পাখম মরে গেছে!

ভয়ে চিৎকার করে উঠল চাকর-ছেলেটা। তখনো সর্দার মাটিতে বসে, দুহাত ঝুলিয়ে আগের মতোই হাসছিলেন। অন্য বাসকিরদের চোখেমুখে বিষাদের ছায়া।

খানিক পরেই সর্দার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওকে কবর দাও।' পাখমের চাকর কোদাল তুলে নিয়ে একটা কবর খুঁড়ল। আর তাকে শুইয়ে দেয়া হল সেই কবরে। পাখমের মাথা থেকে পা অবধি কবরে শোয়াতে প্রয়োজন হল মাত্র ছ-ফুট জমি!

আগুনের একটি কণা

এক গ্রামে বাস করত আইভান নামে এক কৃষক। জীবনের বেশিরভাগ সময় সে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই কাটিয়ে এসেছে। আইভান নিজে তো খাটতে পারতই, তা ছাড়া তার ছিল তিনটি যুবক ছেলে। বড়ছেলেটির বিয়ে হয়েছে, মেজোটিরও বিয়ে ঠিক হয়েছে, আর ছোটটিও হয়ে উঠেছে বেশবড়। সে ঘোড়াগুলোর দেখাশোনা করতে পারে, তাছাড়া লাঙল চালাতেও শিখেছে।

আইভানের স্ত্রীও এক চতুর পাকা গিন্নি। তাদের ছেলের বৌটিও যেমন শান্তশিষ্ট তেমনি কর্মঠ। একটা সংসার সুখের হতে যা-কিছু দরকার, এককথায় সবই আইভানের আছে।

এসব ছাড়া সংসারে আরো একটি লোক আছে—আইভানের বুড়ো বাপ। সাতবছর থেকে বুড়ো বুকের অসুখে ভুগছে। দরকার যা-কিছু সবই আইভানের আছে। তার ঘোড়া চারটি, গাভী একটি, ভেড়া পনেরোটি। সংসারে কাপড়চোপড় বলতে যা-কিছু দরকার হয় মেয়েরাই তা তৈরি করে। এ ছাড়া মাঠের কাজেও তারা সাহায্য করে। পুরুষেরা করে জমিচাষের কাজ। তারা ফসল যা পায় তা সারাবছরের জন্যে হয়েও বেশ বাড়তি থাকে। বাড়তি ফসল বিক্রি করে তারা খাজনা এবং অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করে।

কাজেই আইভান আর তার ছেলেদের জীবন পরম সুখেই কেটে যাচ্ছিল বলতে হবে। হয়তো বাকি জীবনও সুখেই কাটত যদি-না তাদের খোঁড়া প্রতিবেশী গ্যাবরিয়েলের সঙ্গে সেবার ঝগড়া বাধত। গ্যাবরিয়েল হল গরডির ছেলে।

এই গরডি যতদিন বেঁচে ছিল এবং আইভানের বাপও তার নিজের সংসার নিজে যতদিন চালাতে পারত ততদিন এরা বেশ ভালো প্রতিবেশীর মতোই মিলেমিশে দিন কাটাত। যে-কোনো এক বাড়ির মেয়েদের কাজকর্মে যদি কোনো জিনিশের অভাব হত বা পুরুষদের কাজে কোনো দরকার হত তবে অপর বাড়িতে খবর পাঠালেই সে-জিনিশ এসে যেত। যখন এক প্রতিবেশীর গরু অপরের ক্ষেতে ঢুকে ফসল নষ্ট করত, তখন গরু তাড়িয়ে সে শুধু বলত : গরুটা এভাবে ছেড়ে দিও না, আমার ফসল নষ্ট করছে।

গরু আটক করে রাখা, কোনো দরকারের জিনিশ না-দেয়া বা একে অপরের সাক্ষাতে বদনাম করা—এসব তখন কেউ ভাবতেও পারত না।

সেসব ছিল যখন বুড়োরা বেঁচেছিল আর ছিল কর্মক্ষম। তারপর যখন ছেলেরা সংসারের

কর্তা হল সেই থেকে লাগল সবকিছুতেই গোলমাল।

যতকিছু মুশকিলের গোড়ায় ছিল নেহাত তুচ্ছ এক–একটা ব্যাপার।

আইভানের ছেলের বৌ একটা মুরগি পুষত। সেটা ডিম দিতে শুরু করেছে। ইস্টার–পর্বের সময় কাজে লাগবে বলে এখন থেকেই ডিমগুলো জমাতে আরম্ভ করেছে বৌ। প্রত্যেকদিন সে গাড়ি রাখবার একচালা ঘরে গিয়ে একটা করে ডিম কুড়িয়ে আনে। কিন্তু একদিন ডিম দিতে গিয়ে মুরগিটা ছেলেপুলেদের চিৎকারে ভয় পেয়ে বেড়ার উপর দিয়ে উড়ে পাশের বাড়িতে গিয়ে সেদিনের ডিমটা সেখানেই পাড়ল। মুরগিটার কক্কক্ শব্দ বৌয়ের কানে গিয়েছে কিন্তু সে তখন কাজে ব্যস্ত। সে ভাবল এখন ফুরসৎ নেই, ঘর–দুয়ার পরিষ্কার করতে হবে। ডিমটা ও–বাড়ি থেকে পরে নিয়ে এলেই চলবে।

বিকেলে বৌ একচালায় গিয়ে দেখল, ডিম নেই। শাশুড়ি ও দেবরকে জিজ্ঞেস করে জানল, তারাও কেউ ডিম আনেনি।

তখন ছোট দেবর তারাস বলল, তোমার মুরগি আজ ও–বাড়িতে গিয়ে ডিম দিয়েছে। ও বাড়ির উঠান থেকে কক্কক্ করতে–করতে মুরগিটাকে আমি বেড়ার উপর দিয়ে আসতে দেখেছি।

বৌ মুরগিটা একবার খুঁজে দেখতে গেল। কতগুলি বাচ্চার সঙ্গে বসে আছে মুরগিটা। তার চোখদুটো যেন ঘুমে বুজে আসছে। বৌয়ের মনে হল, মুরগিকে যদি কথাটা জিজ্ঞেস করা যেত আর মুরগি সে জবাব দিতে পারত তাহলে বেশ হত।

অবশেষে সে পাশের বাড়িতে গেল। তাকে দেখে গ্যাবরিয়েলের মা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কিগো বাছা, কী মনে করে?

হাঁ দাদি, আজকে ভোরে আমাদের একটি মুরগি উড়ে এসেছিল আপনাদের বাড়ি। মুরগিটা একটা ডিম দিয়ে যায় নি কি?

না, আমরা তো কোনো ডিম–টিম দেখিনি। আমাদের মুরগিই অনেকদিন থেকে ডিম দিতে আরম্ভ করেছে। আমাদের ডিমই আমরা জড়ো করে রাখছি, অন্যের ডিম দিয়ে কী করব? অন্যের মুরগিতে ডিম দিচ্ছে কিনা তা আমরা দেখতে যাই না বাছা।

তার কথা শুনে আইভানের ছেলের বৌ মনে–মনে রেগে গেল। রাগের মাথায় সে গ্যাবরিয়েলের মাকে বেশ কয়েক কথা শুনিয়ে দিল। গ্যাবরিয়েলের মাও জবাব দিতে ছাড়ল না। এমনি করে দুজনেই আরম্ভ করে দিল চেঁচামেচি। আইভানের স্ত্রী তখন পানি আনতে গিয়ে সে–পথ দিয়েই ফিরছিল। পানির ঘড়া নামিয়ে রেখে সেও বৌর পক্ষ হয়ে ঝগড়া শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল গ্যাবরিয়েলের স্ত্রী। সে এসে সত্যি–মিথ্যে অনেককিছু মিলিয়ে আইভানের ছেলের বৌকে দোষারোপ করতে লাগল। তখন দুইদলে রীতিমতো কথার লড়াই শুরু হয়ে গেছে। সবাই তখন চিৎকার করে বলছে। কেউ বলছে : তুই চোর। কেউ বলছে : তুই বজ্জাত। একজন বলছে : তুই বুড়ো শ্বশুরকে না –খাইয়ে মারছিস। আরেকজন তখন বলছে : আমি যে–থলেটা সেদিন দিয়েছিলাম সেটা তুই ফুটো করে দিয়েছিস। তখন একজন বলল, আমাদের হাঁড়ি না হলে তোদের দুধ রাখা চলে না। এখখুনি হাঁড়ি ফেরত দিতে হবে। বলেই দুধ ঢেলে ফেলে হাঁড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

এরপর দু–দলে চুলোচুলি হতেও বাকি রইল না। পুরোদমে লড়াই শুরু হয়ে গেল। এমন সময় মাঠ থেকে ফিরে এল গ্যাবরিয়েল। সে তখন বৌকে ঝগড়ায় সাহায্য করতে লেগে গেল। তখন আইভান চুপ করে বাড়িতে বসে থাকতে পারে না! সে আর তার ছেলেরাও এসে যুদ্ধে

যোগ দিল।

আইভানের গায়ে জোর সবচেয়ে বেশি। সে এসেই সবাইকে হটিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, গ্যাবরিয়েলের একগোছা দাড়িও সে ছিঁড়ে ফেলল ! আশেপাশের লোকজন সব ছুটে এল কী হয়েছে তাই দেখতে। তারা এসে কোনোরকমে দু–দলকে থামিয়ে দিল।

এমনি করেই ব্যাপার একদিন শুরু হয়েছিল।

গ্যাবরিয়েল তার ছেঁড়া দাড়ি একটুকরো কাগজে বেঁধে নিয়ে গেল জেলার সদরে, সে আইভানের নামে নালিশ করবে বলে। যাবার আগে বলে গেল, এত করে দাড়ি রেখেছিলাম কি ঐ শয়তান এসে ছিড়বে বলে। এদিকে তার স্ত্রীও পাড়া বেড়িয়ে বলতে লাগল, এবার বুঝবে মজা ! আইভানকে সাইবেরিয়ার জেলে পাঠিয়ে তবে ছাড়ব।

এমনি করে দু–বাড়ির ঝগড়া দিনদিন বেড়েই চলল।

আইভানের বুড়ো বাপ প্রথম থেকেই চেষ্টা করছিল ঝগড়া থামিয়ে দু–দলে একটা মিটমাট করিয়ে দিতে। কিন্তু কার কথা কে শুনবে? সে বুড়ো বলছিল, তোরা এসব বড় অন্যায় করছিস। এমন তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কখনো ঝগড়া করতে আছে? একটিবার চিন্তা করে দেখ, এতবড় কাণ্ডটা ঘটে গেল কিনা মুরগির সামান্য একটা ডিম উপলক্ষ করে ! হয়তো একটি ডিম ও–বাড়ির ছেলেমেয়েরা কুড়িয়ে নিয়েছে। তাতে কী এসে যায়? কত তার দাম? ঈশ্বর তো না–চাইতে অনেক আমাদের দিয়েছে ! আর নাহয় তোদের পাড়াপড়শী একটা অন্যায় কথা বলেই ফেলেছে—সেটা শুধরে দিলেই হয়। ভালো কথা কী করে বলতে হয় শিখিয়ে দেয়াই তো ভালো। আর ঝগড়া যদি কখনো লেগেই যায় তা ভুলে গিয়ে মিটমাট করলেই তো সব চুকে যায়। রাগ না থামলে বেড়েই চলে এবং এতে তোদেরই ক্ষতি হবে।

বুড়োর কথায় কান দিতে কেউ রাজি নয়। তারা ভাবল, এসব বুড়োর আবোলতাবোল বকা ছাড়া আর কিছুই নয়। আইভান হার মানতে পারবে না। সে বলল, আমি কখখনো তার দাড়ি টেনে ছিড়িনি ! সে নিজেই নিজের দাড়ি ছিড়েছে। বরং ওর ছেলে আমার ওপর গর্জে এসে পড়েছিল। এই দেখ আমার জামা ছেঁড়া। আইভানও চলে গেল কোর্টে নালিশ করতে। দু–তরফ থেকেই কোর্টে মামলা চলতে লাগল।

এমন সময় একদিন হল কী, গ্যাবরিয়েলের গাড়ির একটা প্রকাণ্ড খিল নেই। তার আত্মীয়দের মধ্যে কেউ কেউ বলল, এ–কাজ আইভানের ছেলে ছাড়া আর কেউ করেনি। তারা সেদিন রাত্রে ছেলেটাকে দেখেছে জানালার পাশ দিয়ে গ্যাবরিয়েলের গাড়ির দিকে যেতে। একজন বলল, হ্যাঁ গাড়ির সেই খিলটা সে হোটেলঅলার কাছে বিক্রি করতে গিয়েছিল।

কাজেই এই নিয়ে নতুন একটা মামলা শুরু হল। এদিকে বাড়িতেও একটা দিন তাদের ঝগড়া ছাড়া কাটে না। শুধু ঝগড়া নয়, মারামারিও এখন নিত্যকার ব্যাপার। এমনকি বড়দের দেখাদেখি ছোটরাও এখন একে অপরকে দেখে চিৎকার করে গালাগাল করতে ছাড়ে না।

কাপড় কাচতে গিয়ে মেয়েদের যখন ঘাটে দেখা হয় তখন হাতের চেয়ে তাদের জিভ চলে বেশি। তখন ভালো কথা তারা একটিও বলে না। পুরুষরা প্রথমে একে অপরকে গালাগালি করেই ক্ষান্ত থাকত, এখন হাতের কাছে যে–যা পায় তাই নিয়েই আক্রমণ করে। তাদের দেখাদেখি ছেলেমেয়েরাও তাই করতে শিখেছে। এমনিভাবে জীবন তাদের দিনের পর দিন বোঝার মতো হয়ে চলেছে। আইভান আর গ্যাবরিয়েলের মামলা করা ছাড়া আর কোনও কাজ

নেই, চিন্তাও নেই। জেলার কোর্টে নানারকম মামলা, আবার গ্রামে শালিসি। এমনি করে বিচারকরাও তাদের উপর বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

প্রথমে একটা মামলায় আইভানের হল জরিমানা, অনাদায়ে জেল। পরের মামলায় গ্যাবরিয়েলের হল একই সাজা। তারা যতবেশি কোর্টে যাতায়াত করে ততই বেড়ে চলে তাদের জেদ—ঠিক দুটো কুকুরের মতো। একটা কুকুর যখন আরেকটা কুকুরকে আক্রমণ করে তখন এমনি করেই তাদের জেদ বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে তাদের হিংস্রতাও। দুটো কুকুর যখন ঝগড়া করে তখন কেউ একজন এসে হয়তো পেছন থেকে একটা লাঠির ঘা মারে, অমনি সেই কুকুর ভাবে তার শত্রুই তাকে মারছে। সে তখন আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। এ দুই কৃষক-পরিবারের অবস্থাও সেইরকম হয়ে উঠেছে। কারও জেল বা জরিমানা হলে অপরের উপর আক্রোশ বেড়ে যায়। তখন সে বলে : দাঁড়াও, শিগ্গিরই এর মজা টের পাবে। এমনি করে তাদের মামলা চলল ছ-বছর ধরে।

আইভানের বুড়ো বাপ বিছানায় শুয়ে আগের মতোই উপদেশ দিয়ে যায়। বুড়ো কেবলই বলে : বাবা, তোমরা এসব কী আরম্ভ করেছ? ঝগড়াঝাঁটি থামাও—নিজের-নিজের কাজে মন দাও। একজন আরেকজনকে এভাবে ঘৃণা কোরো না। তাতে তোমাদের সবারই ভালো হবে। যত বেশি ঝগড়া করবে ততই সর্বনাশ হবে তোমাদের।

কিন্তু বললে কী হবে? বুড়োর কথায় কেউ কান দেয় না।

এমনি করেই ছ-বছর কাটল। সাত বছরের শুরুতে আবার এক কাণ্ড! এক বিয়েবাড়িতে গিয়ে আইনভানের ছেলের বৌ বলল, গ্যাবরিয়েল একবার ঘোড়া চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল।

গ্যাবরিয়েল তখন ভদ্কা খাচ্ছিল। কথাটা শুনে সে রাগ সামলাতে পারল না। সে বৌটিকে এমন এক ঘুসি মারল যে একসপ্তাহ বিছানায় পড়ে থাকতে হল তাকে।

আইভান এ-ঘটনায় বরং খুশিই হল। আবার কোর্টে গিয়ে গ্যাবরিয়েলকে জব্দ করতে নতুন একটা সুযোগ পাওয়া গেল। সে বলল, এইবার ওকে সাইবেরিয়ার জেলে না-পাঠিয়ে আর ছাড়ছি না। কিন্তু আইভান যা ভেবেছিল বাস্তবে তা হল না। বিচারক এবার গ্যাবরিয়েলকে কোনো সাজাই দিল না। আইভানের ছেলের বৌকে কোর্টে হাজির করে জেরা করা হল। তখন সে পুরোপুরি ভালো হয়ে গেছে। কেউ তাকে সত্যিই মেরেছিল এমন কোনও প্রমাণ দেখাতে পারল না সে।

বিচারে আইভানের মন ভরল না। সে এবার আপিল করল। আপিল কোর্টের লোকদের সে এক গ্যালন পেট্রোল ঘুস দিল। তার ফলে এবার বিচারে গ্যাবরিয়েলকে বিশ ঘা বেত হুকুম হল। গ্যাবরিয়েলের সামনে বিচারকদের রায় পড়ে শোনানো হল। আইভানও শুনতে পেল তা। শুনতে পেয়ে সে গ্যাবরিয়েলের দিকে তাকাল। তার মুখ তখন মলিন। সে উঠে বারান্দার দিকে গেল। আইভানও নিজের ঘোড়াটা দেখে আসবার ভান করে তার পিছুপিছু গেল। গিয়ে শুনল, গ্যাবরিয়েল বলছে, বেশ সে আমাকে মেরে পিঠের জ্বালা বাড়াবে কিন্তু তারও জ্বালা এমনভাবে বাড়তে পারে যে কী বলব!

কথাটা শুনেই আইভান আবার কোর্টে গিয়ে ঢুকল। বিচারককে বলল : হুজুর, ও আমার ঘর জ্বালিয়ে দেবে বলছে। কয়েকজন লোক তাকে এ-কথা বলতে শুনেছে।

ডাকা হল গ্যাবরিয়েলকে। জিজ্ঞেস করা হল, সত্যিই তুমি আইভানের ঘর জ্বালিয়ে দেবে বলেছ?

রাগে তখন গ্যাবরিয়েলের ঠোঁট কাঁপছে। সে বলল, আমি কাউকে কিছু বলিনি। তোমাদের খুশি হলে তোমরা আমাকে মারো। মনে হচ্ছে আমারই যত দোষ, যদিও কিছুই আমি করিনি। ওদিকে আরেকজন যা-খুশি করে যাচ্ছে।

গ্যাবরিয়েল আরো কী যেন বলতে চাইছিল কিন্তু রাগে তার কথা মুখ দিয়ে সরছিল না। সে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। কোর্টের লোকজন তার চোখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে গেল। তারা ভাবল, মানুষ এরকম মনের অবস্থা নিয়ে নিজের বা অন্যের যে-কোনোরকম অনিষ্ট করে ফেলতে পারে।

বুড়ো বিচারক দুপক্ষকে ডেকে অনেক করে বোঝালেন ঝগড়া মিটিয়ে ফেলতে। তিনি বললেন, দেখ গ্যাবরিয়েল, একজন মেয়েলোককে ওভাবে আঘাত করা কি তোমার উচিত হয়েছে? ভ্যাগ্যিস তুমি তাকে বেশি আঘাত করোনি। তবু চিন্তা করে দেখ, এর ফলে কী না হতে পারত? তুমি বরং অপরাধ স্বীকার করে ওর কাছে মাফ চেয়ে নাও, আমি আমার রায় বদলিয়ে দিচ্ছি।

গ্যাবরিয়েল বলে উঠল, আসছে বছর আমি পঞ্চাশে পা দিচ্ছি। আমার ছেলেরও বিয়ে হয়ে গেছে। জীবনে আমি কখনও মার খাইনি, আর এখন কিনা ঐ শয়তান আইভানটার কথায় আমাকে মার দেয়ার হুকুম হয়েছে! আমি যাব ওর কাছে ক্ষমা চাইতে?—না, অনেক দুর্ভোগ ভুগেছি আমি—আইভান এ-কথা যেন ভুলে না যায়।

গ্যাবরিয়েলের গলা কেঁপে উঠল, সে কথা বলতে পারছিল না। বাইরে বেরিয়ে গেল সে।

কোর্ট থেকে বাড়ি সাতমাইল রাস্তা। আইভান যখন বাড়িতে পৌঁছল তখন বেলা আর বিশেষ বাকি নেই। জিন খুলে ঘোড়াটা আস্তাবলে রেখে সে ঘরে ঢুকল। ঘরে তখন কেউ নেই। মেয়েরা গরু-ঘোড়া বাড়ি আনতে গেছে, ছেলেরা মাঠ থেকে বাড়ি ফেরেনি তখনও। আইভান একলা বসে ভাবছিল। তার মনে পড়ল বিচারকের রায় শুনে গ্যাবরিয়েলের মুখ কীভাবে মলিন হয়ে দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে ছিল। গ্যাবরিয়েলের প্রতি একটু যেন করুণা হল আইভানের। এমন সময় সে দেখতে পেল, তার বুড়ো বাপ কাশতে কাশতে কষ্টে উঠে বিছানার উপর বসেছে। তারপর নেমে ধীরে ধীরে এসে সে একখানা আসন দখল করে বসল। কথা বলবার আগে আবার সে কেশে উঠল। কাশতে কাশতে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে টেবিলের উপর ভর করে সে জিজ্ঞেস করল, ওর কি শেষপর্যন্ত সাজা হয়ে গেল বাবা আইভান?

আইভান জবাব দিল, হ্যাঁ, বিশ ঘা বেত।

বুড়ো বলে উঠল : এ ভারি খারাপ কথা। তুমিও ভালো কাজ করছ না আইভান। হাঁ খারাপ, সত্যিই খারাপ কাজ এসব। ওর পক্ষে যত-না খারাপ তার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ তোমার পক্ষে। বেশ, ওরা যদি গ্যাবরিয়েলকে মারে তবে তোমার কী লাভ হবে তাতে?

আইভান বলল, লাভের এই হবে, সে এরকম কাজ আর করবে না।

'সে কীরকম কাজ আর করবে না? সে তোমার চেয়ে এমন কী খারাপ কাজটা করেছে?'

'কেন, সে কি আমাদের কম অনিষ্ট করেছে! একবার ভেবে দেখ, সে আমার ছেলের বৌকে তো প্রায় মেরেই ফেলেছিল। তাছাড়া সে কেমন করে বলে যে আমার বাড়িঘর সব পুড়িয়ে দেবে? এসব কাজের জন্যে আমি কি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে আসব?'

বিমর্ষভাবে মাথা নেড়ে বুড়ো বলল, আমি কয়েক বছর ধরে রোগশয্যায় পড়ে আছি আর তুমি দুনিয়া ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছ। তাতেই মনে করেছ তুমি সব জানো আর আমি জানি না কিছুই, দেখতেও পাই না। না বাবা, তুমিই কিছু দেখতে পাও না, ঘৃণা তোমাকে অন্ধ করে

রেখেছে। অন্যের দোষ তোমার চোখের সামনে কিন্তু নিজের দোষ সব আড়ালে। সে যদি খারাপ হয়ে থাকে আর তুমি ভালো হও তবে ঝগড়া হতে পারে না। তার দাড়িগুলো কে ছিড়েছিল? তার খড়গুলোই-বা কে নষ্ট করেছিল? তাকে কে কোর্টে টেনে নিয়েছিল প্রথমে? তবু তুমি শুধু তারই দোষ দেখতে পাচ্ছ। তুমি-যে নিজে ভালো নও সেটাই হয়েছে মুশকিল। আমি জীবনে কোনোদিন তোমার মতো ছিলাম না। ওর বুড়ো বাপ আর আমি কি কখনও তোমাদের মতো করেছি বলতে পারো? প্রতিবেশীদের যেরকম হওয়া উচিত আমরা তাই ছিলাম। কিন্তু এখন? সেদিন সেই সৈনিকটি যুদ্ধের গল্প করছিল। তুর্কীদের সঙ্গে আমাদের সেবার যে-লড়াই হয়েছিল তার চেয়েও ভীষণ লড়াই চলছে তোমার আর গ্যাবরিয়েলের মধ্যে। কী আফসোসের ব্যাপার! তুমি সংসারের কর্তা, তোমারই সব দায়িত্ব। ছোটরা কী শিক্ষা পাচ্ছে তোমাদের এই আচরণে? ছেলেরা তোমার বড় হয়েছে। তোমার উচিত ছিল তাদের সঙ্গে থেকে সংসারের কাজকর্ম দেখা। সময়ে জমি চাষ হচ্ছে না, বীজ বোনা হচ্ছে না। এ-বছর ফসলের অবস্থা এমন হল কেন? মনে আছে কখন এবার তুমি জমি বুনেছিলে? শহর থেকে মামলা করে ফিরে এসে। কী এমন লাভ হল তাতে? বাবা, এসব ফেলে ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে নিজের কাজকর্ম দেখাশুনা করগে।

আইভান একটি কথাও বলল না। সে ভাবতে লাগল, বাবা যা বলছেন সবই সত্যি।

ভাবতে ভাবতে মনটা তার একটু নরম হয়ে এল। কিন্তু কী করে মিটমাট আরম্ভ করবে?

বুড়ো বাপ যেন ছেলের মনের কথা বুঝতে পারল। তাই সে আবার বলে উঠল, যাও আইভান আর দেরি নয়। আগুন ছড়িয়ে পড়বার আগেই নিভিয়ে এসো। নয়তো সে-সুযোগ আর পাবে না।

বুড়ো আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল এমন সময় বাড়ির মেয়েরা সব ফিরে এল। পাখির মতো কিচিরমিচির করছিল তারা। গ্যাবরিয়েলের সাজা হয়েছে এবং সে ঘর পুড়িয়ে দেবে বলছে, এসব তারা মাঠেই শুনেছে। শুনে গ্যাবরিয়েলের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আচ্ছা করে ঝগড়া করে এসেছে। একজন বলছিল, গ্যাবরিয়েলের ছেলের বৌ নাকি আবার একটা নতুন মামলা করবে বলেছে। আরেকজন বলছিল, স্কুলের মাস্টার নাকি আবার একটা দরখাস্ত লিখতে শুরু করেছে আইভানের বিরুদ্ধে। এবারের দরখাস্ত একেবারে স্বয়ং জারের বরাবরে। গাড়ির খিল চুরি করা থেকে শুরু করে সবই থাকবে এতে।

মেয়েদের কথাগুলো শুনছিল আইভান। তার মন আবার শক্ত হয়ে উঠল। গ্যাবরিয়েলের সঙ্গে আপস করার চিন্তা সে মন থেকে মুছে ফেলল।

খামারে করবার মতো অনেক কাজই করতে বাকি থেকে যায়। আইভান মেয়েদের কিছু না বলে খামারের দিকেই গেল। সূর্য ডোবার আগেই সব কাজ সেরে, ছেলেরা মাঠ থেকে ফিরে এল। শীতের ফসল বুনবার জন্যে তারা জমি চাষ করছিল। আইভান তাদের দুএকটি উপদেশ দিল। ঘোড়ার গলার একটা কলার মেরামত করতে হবে বলে সেটাও তুলে রাখল। ঘাস খেতে দিল গরুগুলোকে। তারপর ভাবল, এবার খেয়ে ঘুমাতে হবে।

তখন ঘোড়ার গলার কলারটা নিয়ে সে বাড়ি ফিরছিল। গ্যাবরিয়েলের কথা ততক্ষণে ভুলেই গেছে। তার বাবা যা বলেছে তাও তার মনে নেই। সে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকবে এমন সময় পাশের বাড়িতে কে বলছিল, ওকে খুন করা উচিত।

এ-কথা কানে যেতেই আইভানের মনে আবার আক্রোশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। গ্যাবরিয়েল যতক্ষণ কথা বলল আইভান তার সবটুকু শুনে ঘরে চলে এল।

ঘরে আলো জ্বলছিল। তার ছেলের বৌ একটা জামা তৈরি করছে। তার স্ত্রী করছিল রাত্রের খাবার ব্যবস্থা। বড়ছেলেটা জুতো মেরামতে ব্যস্ত। ছোটটি টেবিলের পাশে বসেছে একটা বই খুলে। ঘরের কোথাও অশান্তি নেই, শুধু দুষ্টু পড়শী নিয়ে বাস করবার অশান্তি ছাড়া।

আইভান ঘরে ঢুকল রাগে কাঁপতে কাঁপতে। একটা বিড়াল বসেছিল চেয়ারে। ওকে সে তাড়া করল। তারপর মেয়েদের সঙ্গে চেঁচামেচি করল পথের মাঝে একটা ঘড়া রেখেছে বলে। ঘোড়ার কলারটা মেরামত করতে তার মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠল। তার কানে কেবল গ্যাবরিয়েলের কথাই বাজছে : ওকে খুন করা উচিত।

ছোট ছেলে তারাস রাত্রের খাওয়া সেরে মাঠে যাচ্ছিল ঘোড়া নিয়ে। আইভান তার সঙ্গে বাইরে গেল। যতক্ষণ ঘোড়ার পায়ের শব্দ মিলিয়ে না যায় ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গ্যাবরিয়েলের কথাটাই সে মনে করছিল, 'তারও জ্বালা একদিন এমনভাবে বাড়তে পারে যে কী বলব।'

আইভান ভাবতে লাগল, গ্যাবরিয়েলটা পাগল। সবকিছু তো শুকনো খট্‌খটে হয়ে আছে। জোর বাতাসও বইছে। সে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের পেছনে এসে আগুন লাগিয়ে পালাবে। সে বেঁচে গিয়ে হাসবে আর আমাকে বিদ্রূপ করবে। কিন্তু যদি ধরে ফেলতে পারি তবে ব্যাপার হবে অন্যরকম।

কুচিন্তাটা আইভানের মনে জেঁকে বসেছে, বাড়ির ভেতর যাবার কথা তখন আর তার মনে নেই। সে বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে, বাড়ির চারধারটা একটু ঘুরে আসা যাক। কে জানে গ্যাবরিয়েল কোথায় কী চক্রান্ত করে রেখেছে।

ধীরে ধীরে পা ফেলে সে গেট পার হল। একটা বাঁক ঘুরতেই তার মনে হল অপরদিকের কোণে কী যেন একটা দেখা দিয়েই আবার সরে গেল আড়ালে। আইভান অনেকক্ষণ কান পেতে সামনের দিকে চেয়ে রইল। বাতাসে গাছের পাতার শব্দ হচ্ছে। এ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না কোনোদিকে।

প্রথমে সবকিছু ছিল গাঢ় অন্ধকার। অনেকক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকার পরে এখন কোণের ওপাশটা বেশ দেখা যাচ্ছে। একটা লাঙল পড়েছিল ওখানে, দেখা যাচ্ছে সেইটাই। খড়ের চালের নিচের দিকটাও দেখা যাচ্ছে কেমন ঝুলে আছে। চেয়ে থেকে আর কিছুই সে দেখতে পেল না।

আইভানের মনে হল, হয়তো আমারই দেখার ভুল, আসলে কেউ আসেনি ওখানে। তবু একটিবার ঘুরেই দেখে যাই-না কেন? কোণের শেষদিকে হঠাৎ আগুনের একটা শিখা জ্বলে উঠেই নিভে গেল। আইভানের যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। হঠাৎ আবার দেখতে পেল, আগের চেয়েও উজ্জ্বল আগুনের শিখা একই জায়গায় জ্বলে উঠেছে। এবার সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে টুপি-মাথায় একটা লোক তার দিকে পেছন ফিরে উপুড় হয়ে হাতে-ধরা একমুঠো শুকনো খড়ে আগুন লাগাচ্ছে। আইভানের বুকের স্পন্দন তখন বেড়ে গেছে। সে দ্রুত পা ফেলে সেদিকে যেতে যেতে ভাবল, এবার বাছাধন তুমি হাতেনাতে ধরা পড়বে। এবার আর পালাতে পারবে না।

আইভান একটু দূরে থেকেই দেখল, আগের চেয়ে বেশি উজ্জ্বল একটা শিখা জ্বলে উঠেছে। এবার জ্বলছে অন্য জায়গায়। খড়ের চালে আগুন ধরে গেছে এবং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে গ্যাবরিয়েল সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা বাজপাখি যেমন করে ছোটপাখির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আইভানও ঠিক তেমনিভাবে খোঁড়া গ্যাবরিয়েলকে ধরবার জন্যে ছুটল। সে ভাবছিল গ্যাবরিয়েলকে ধরতেই হবে, পালাতে দেবে না কিছুতেই। কিন্তু গ্যাবরিয়েল তার পায়ের শব্দ পেয়ে নিজের খোঁড়া পা নিয়ে ঠিক একটা খেঁকশিয়ালের মতো দৌড়ে পালাল।

আইভান তার পেছনে ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে উঠল, এবার আর রেহাই পাবে না।

আইভান হাত বাড়িয়ে গ্যাবরিয়েলের কোটের নিচের দিকটা ধরে ফেলেছিল। গ্যাবরিয়েল দৌড়াচ্ছে বলে কোটের খানিকটা ছিড়ে আইভানের হাতে রয়ে গেল। টাল সামলাতে না–পারায় সে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠেই আবার সে চিৎকার আরম্ভ করল : কে কোথায় আছে, ডাকাত পড়েছে ! ডাকাত ! আগুন !

ততক্ষণে গ্যাবরিয়েল নিজেদের দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। তাকে ধরতে যাবে এমন সময় তার নাকের উপর দিকটায় কিসের যেন একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগল। গ্যাবরিয়েল মোটা একটা কাঠের টুকরো তুলে আঘাত করেছে।

আইভান মাটিতে পড়ে গেল। এবার যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠল তার চোখের সামনে, পরক্ষণে সব অন্ধকার ! যখন তার জ্ঞান ফিরে এল তখন গ্যাবরিয়েল ধারেকাছে নেই। দিনের মতো আলোয় চারিদিক ছেয়ে গেছে। তার বাড়ির দিকে ভয়ানক শোরগোল তো নয়, যেন একটা ইঞ্জিন চলেছে ! আইভান ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে, তাদের বাড়ির পেছনের ঘর দুখানা আগুনে দাউদাউ করে জ্বলছে।

আগুনের শিখা, সেইসঙ্গে ধোঁয়া আর জ্বলন্ত খড়কুটো ছিটকে ছড়িয়ে পড়ছে তার ঘরের দিকে !

দুহাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে আইভান চিৎকার করতে লাগল, এ কী হল ভাইসব ! আমার উচিত ছিল চাল থেকে জ্বলন্ত খড়গুলো টেনে আগুন নিভিয়ে ফেলা। হায়, হায়, এ কী হল ভাইসব !

হতভম্বের মতো সে একই কথা বিড়বিড় করে বলতে লাগল ! তার চিৎকার করতে ইচ্ছা হচ্ছিল কিন্তু দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে, মুখে কথা ফুটছে না। সে দৌড়োতে চায় কিন্তু পাগুলো যেন তার আয়ত্তের বাইরে। দৌড়াতে গিয়ে এক পা আরেক পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। সে টল্‌তে টল্‌তে উঠে দাঁড়াল। দম নিয়ে পা বাড়াল সামনের দিকে। আগুনের কাছে গিয়ে পৌঁছবার আগেই পাশের চালাঘরে এবং গেটে আগুন ধরে গেল। ঘরের ভেতর থেকে যেন আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে। এখন উঠানে গিয়ে দাঁড়ানোও সম্ভব নয়। লোকজন অনেক এসে জড়ো হয়েছে কিন্তু তাদের কারো কিছু করবার নেই। পাড়াপড়শীরা সবাই নিজ নিজ ঘরের জিনিশপত্র বের করছে, আস্তাবল থেকে ঘোড়া বের করছে, আইভানের বাড়িটা জ্বলে যাবার পরে গ্যাবরিয়েলের বাড়িতেও আগুন ধরেছে ! তারপর বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে সে–আগুন ছড়িয়ে পড়েছে পাশের বাড়িতে। এমনি করে আইভানদের বাড়ি থেকে শুরু করে গ্রামের একটা পাড়া পুড়ে শেষ হয়ে গেল।

আইভানের বাড়িতে তার বুড়ো বাপকে কোনোরকমে সবাই ঘর থেকে বের করে এনেছে। বাড়ির আর সবাই এসেছে নিজের নিজের পরার কাপড়টুকু সঙ্গে নিয়ে। ঘোড়া কটা নিয়ে ছোটছেলেরা মাঠে গিয়েছিল। সে কটা ছাড়া বাকি সব গরু–বাছুর–ভেড়া, এমনকি হাঁস–মুরগিগুলো পর্যন্ত জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গাড়ি, লাঙল, মেয়েদের কাপড়–জামা বোঝাই বাক্স—কিছুই পুড়তে বাকি নেই।

গ্যাবরিয়েলের বাড়ির গরু–ঘোড়াগুলো বের করা হয়েছিল আর সেইসঙ্গে বের করা হয়েছিল অন্যান্য কিছু জিনিশপত্র।

সারারাত ধরে আগুন জ্বলতে লাগল। জ্বলন্ত বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আইভান শুধু বলতে লাগল : আমার এ কী সর্বনাশ হল ভাইসব? একজন কেউ এসে চাল থেকে আগুনটা টেনে ফেললেই হত, আগুন নিভে যেত।

একটা চাল পুড়ে নিচে পড়ে যেতেই আইভান ছুটল একটা আধপোড়া চেয়ার সেখান থেকে বাঁচাতে। বাড়ির মেয়েরা তাকে ওদিকে যেতে বারণ করল। একটা চেয়ার এনে আরেকটা আনতে যেতেই আইভান পা ফস্‌কে আগুনের মধ্যে পড়ে গেল। বড়ছেলেটা তাই দেখতে পেয়ে কোনোরকমে তাকে টেনে বের করে আনল। আইভানের দাড়ি, চুল এবং কাপড়–জামা এরই মধ্যে পুড়ে গেছে। তার হাত দুখানাও পুড়ে কালো হয়ে গেছে কিন্তু মনে হচ্ছে আইভান নিজে যেন কিছুই বুঝতে পারছে না, জ্বালা–যন্ত্রণা বুঝবার শক্তি যেন তার নেই। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, লোকটি শোকে পাগল হয়ে গেছে।

আগুনের তেজ ক্রমশ কমে আসছে। আইভান তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আপন মনে বলে চলেছে, এ কী হল? একজন কেউ সঙ্গে সঙ্গে আগুনটা নিভিয়ে ফেললেই তো পারত!

ভোরবেলা গ্রাম–সরদারের ছেলে এসে আইভানকে বলল, তোমার বাবা বোধহয় আর বাঁচবেন না। খুব সম্ভব তাঁর শেষ সময় উপস্থিত হয়েছে। তোমাকে শেষ–দেখা দেখতে চাইছেন। শিগগির চলো আইভান। এই বলে সে আইভানের হাত ধরে টানতেই আইভান তার অনুসরণ করল।

আইভানের বুড়ো বাবাকে যখন সবাই ধরাধরি করে বাইরে আনছিল তখন কতগুলো জ্বলন্ত খড় এসে তার গায়ে পড়ে। ফলে শরীরের কয়েক জায়গা তার পুড়ে যায়। সে–অবস্থায় তাকে নিয়ে তোলা হয় গ্রামের একপাশে সরদারের বাড়িতে। সেদিকটায় কোনো ক্ষতি করতে পারেনি আগুন।

আইভান যখন তার বাবার কাছে গিয়ে পৌঁছল তখন সেই ঘরে সরদারের স্ত্রী আর তার ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কেউ ছিল না। বাকি সবাই তখন আগুনের কাছে। বুড়ো বিছানায় শুয়ে ছিল জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে। তার দৃষ্টি দরজার দিকে। ছেলেকে ঘরে ঢুকতে দেখে বুড়ো একবার নড়ে উঠল। গ্রাম–সরদারের স্ত্রী কাছে গিয়ে বলল, এই–যে আপনার ছেলে আইভান এসেছে।

বুড়ো আইভানকে আরও কাছে আসতে বলায় সে এগিয়ে বুড়োর কাছে গিয়ে বিছানা ঘেঁষে দাঁড়াল।

বুড়ো বলল, আমি তোমাকে কী বলেছিলাম, আইভান? গ্রামটাকে শেষপর্যন্ত জ্বালিয়ে দিলে?

আইভান জবাব দিল, গ্যাবরিয়েল জ্বালিয়েছে বাবা। আমি তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিলাম। আমি নিজে দেখেছি তাকে একগোছা খড় জ্বালিয়ে ঘরের চালে আগুন ধরাতে। আমি খড়ের গোছাটা নিয়ে নিভিয়ে ফেলতে পারতাম। তাহলে কিছু হত না।

বুড়ো বলতে লাগল, আইভান, আমি পরপারে যেতে বসেছি। সময় এলে তুমিও একদিন আমার অনুসরণ করে মরণের কোলে ঢলে পড়বে। দোষটা কে করেছে?

আইভান নীরবে চোখ তুলে বাবার দিকে চাইল। সে কোনো কথা বলতে পারছিল না।

'এখন ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে বলো, কে অন্যায় করেছে? আমি তোমাকে কী

বলেছিলাম?'

সহসা আইভানের জ্ঞান ফিরে এল এবং সবই সে বুঝতে পারল। কম্পিতকণ্ঠে সে জবাব দিল, অন্যায় আমিই করেছি। বলেই সে হাঁটু গেড়ে বাবার বিছানার কাছে বসে আবার বলল, আমাকে ক্ষমা করো বাবা। আমি তোমার কাছে অন্যায় করেছি, ঈশ্বরের কাছেও অন্যায় করেছি।

বুড়ো ডানহাতের মোমবাতি বাঁ-হাতে নিল, তারপর চেষ্টা করল ক্রুশের চিহ্ন আঁকতে কিন্তু তা পারল না। বলল, ঈশ্বরের নাম স্মরণ করো, তাঁর প্রশংসা করো! বলেই ছেলের দিকে চেয়ে আবার বলল, আইভান, আইভান।

কেন বাবা?

তুমি এখন কী করবে?

আইভান কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, এখন কী করে আমরা বেঁচে থাকব কিছুই যে বুঝতে পারছি না বাবা!

বুড়ো তার চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে শক্তি সঞ্চয় করে জবাব দিল, তুমি চালিয়ে নিতে পারবে। ঈশ্বরের আদেশ যদি মেনে চলো তাহলে সবই তুমি চালিয়ে নিতে পারবে।

একটু থেমে মৃদু হেসে বুড়ো আবার বলল, মনে রেখো আইভান, আগুন কে লাগিয়েছে কাউকে বোলো না। অন্যের দোষ ঢেকে রাখলে ঈশ্বর তোমার দ্বিগুণ দোষ ক্ষমা করবেন।

তারপর সে দুহাত দিয়ে বাতিটি ধরল। পা ছড়িয়ে দিল। তার শেষ নিশ্বাস বেরিয়ে গেল।

আইভান গ্যাবরিয়েলের বিরুদ্ধে আর-কিছুই কোনোদিন বলেনি। আগুন কীভাবে লেগেছিল কেউ জানতে পারেনি।

এখন গ্যাবরিয়েলের বিরুদ্ধে আইভানের কোনও রাগ নেই। গ্যাবরিয়েল অবাক হয়ে ভাবে, আইভান কেন কথাটা কারো কাছে প্রকাশ করল না। গ্যাবরিয়েলের মনে প্রথম সত্যি খুব ভয় হয়েছিল কিন্তু সে-ভয় এখন আর নেই। প্রথমে দু-পরিবারের পুরুষরা তাদের ঝগড়া বন্ধ করল। তাদের অনুসরণ করল বাড়ির আর সবাই। যখন নতুন ঘর তৈরি হল তখন দুবাড়ির লোক একঘরেই থাকতে লাগল। আগের মতোই আবার পাশাপাশি তাদের বাড়ি তৈরি হল।

তারা আবার সৎ-প্রতিবেশী হয়ে বসবাস করতে লাগল। আইভান তার বাবার উপদেশ পরবর্তী জীবনে আর ভোলেনি। কেউ তার অনিষ্ট করলেও সে এখন অনিষ্টকারীর ক্ষতি করবার চেষ্টা করে না, বরং মিটমাটের চেষ্টাই করে। আগুন যখন ক্ষুদ্র একটি স্ফুলিঙ্গ থাকে তখনই তা নিভিয়ে ফেলা উচিত।

আইভান এখন আগের চেয়ে অনেক সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করছে।

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র